

মসজিদ আবাদের মেহনত

মূল লেখক

হযরত মাওলানা সা'আদ সাহেব কান্ধলভী

সংকলন ও অনুবাদ

মুফতী মীয়ানুর রহমান কাসেমী

জামেয়া রহমানিয়া আরবিয়া

সাত মসজিদ মাদরাসা

মুহাম্মদপুর, ঢাকা



সূচী পত্র
(প্রথম বয়ান)

* মসজিদ আবাদের মেহনত

৫

*

* দাওয়াত স্বয়ং দাঈর জন্য	৪৫
* ঈমানদারকে মসজিদে এনে মসজিদ আবাদ করতে হবে	৪৭
* মসজিদ আবাদকারীদের জন্য পাঁচটি ওয়াদা	৪৯
* আমল দ্বারা সমস্যার সমাধান হওয়ার দাওয়াত	৫০
* নামাযের বন্টন	৫৩
* তালীমের পদ্ধতি	৫৭
* তালীমে বসার পদ্ধতি	৫৮
* প্রত্যেক জিনিষকে ইলম মনে করা সবচেয়ে বড় মূর্খতা	৬০
* হারাম খাবারের প্রতিক্রিয়া	৬৫
* আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার দ্রুততম পথ	৬৬
* হায়াতুস সাহাবা খুব পড়ুন	৭৩
* সবচেয়ে বড় দাওয়াত ও হেকমত ইকরাম	৭৫
* গন্তব্যস্থলে পৌঁছে জামাআত কি করবে?	৭৭
* মসজিদের পরিবেশে আনাটাই মূল উদ্দেশ্য	৭৮

(তৃতীয় বয়ান)

* ঈমানকে শক্তিশালী করার উপায় চারটি	৮০
* চার জিনিষের সমষ্টিকে কুদরত বলে	৮০
* গায়েব এর ইয়াকীন	৯১
* মানুষের সৃষ্টি	৯৩
* শরীরে রক্ত সঞ্চালন করা	৯৮
* কামাই ছাড়া কিভাবে প্রতিপালিত হবে?	৯৯
* মুরগীর ডিম থেকে আল্লাহর পরিচয়	১০২
* নানীর নাপাক রক্ত দ্বারা প্রতিপালন	১০৩
* আসমান থেকে নেমে এল আঙ্গুলের থোকা	১১১
* শরীরের সাতটি অঙ্গের হরকতের নাম হচ্ছে আমল	১১২
* হযরত জী মাওলানা ইউসুফ (রাহ.) এর আখেরী বয়ান	১১৭
* বেলাল পার্ক লাহোর থেকে ঈমানের ডাক	১১৯
* আল্লাহ তাআলার গায়েবী নেয়াম	১২৫
* ঈমানের আলামত	১৪১

মসজিদ আবাদের মেহনত

উম্মী বয়ান : হযরত মাওলানা সাআদ সাহেব

স্থান : ভূপাল ৬ই ডিসেম্বর ২০০৯ রবিবার

إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

মোহতারাম দোস্তু বুয়ুর্গ! এখানে প্রতি বছর ইজতিমা হওয়াটা একটা নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে। তবে এটা যেন একটা রসম বা প্রথায় পরিণত না হয়ে যায় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) বলতেন, যারা তাবলীগের মেহনতের সাথে জড়িত আছে তাদের নিকট যদি জোহর আর আসরের নামাযের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে তারা নিচের দিকে যাচ্ছে, উপরের দিকে উঠতে পারছে না। আর যদি যোহর থেকে আসরের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে কাজের লাইনে তাদের তারাকী হচ্ছে। আর আমি বলি তাবলীগ আলাদের জন্য শুধু জোহর আসরের মধ্যে পার্থক্য দেখলে হবে না বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত এই পার্থক্য অনুধাবন করতে থাকতে হবে যে, জোহর পড়ার পর আসরের সময় পর্যন্ত মধ্যবর্তি এই সময়টুকুতে আমার জীবনে কি পরিবর্তন এলো তাই চিন্তা করতে হবে-

- * আমরা এই কাজের দ্বারা আজ পর্যন্ত কি অর্জন করতে পারলাম।
- * আমাদের জীবনে কতটুকু পরিবর্তন সাধিত হল।
- * এমন যেন না হয় যে, এই ইজতিমা একটা প্রথা হিসাবেই পার হয়ে গেল।

আমাদের একত্রিত হওয়া নবুওয়াত ও দাওয়াতের নিসবতে

মেরে দোস্তু-আমরা তো বড় একটা নিসবতের প্রেক্ষিতে এখানে একত্রিত হয়েছি, সেটা হচ্ছে দাওয়াত ও নবুওয়াতের নিসবত। এর চেয়ে বড় কোন নিসবত আল্লাহ তাআলা স্থাপিত করেন নি। কেননা যে কাজের

জন্য আশিয়ায়ে কেরামকে নির্বাচিত করা হয়েছে তার চেয়ে বড় কোন কাজই হতে পারে না। সুতরাং আমাদের এই একত্রিত হওয়া অনেক বড় একটা নিসবতের ভিত্তিতে। যে নিসবতে আমরা একত্রিত হয়েছি সেই নিসবতে যেন আমরা আনাচে কানাচে ছড়িয়েও যেতে পারি। অন্য কোন নিসবতে যদি আমরা ছড়িয়ে পড়ি তাহলে আমাদের একত্রিত হওয়াটাও সেই নিসবতে গণ্য হবে। সুতরাং আমাদেরকে খুব ভালভাবে মনে রাখতে হবে যে, এটা ইবাদত ও যিকিরের এমন একটা মজলিস যেখানে ফেরেশতারা যমিন থেকে আসমান পর্যন্ত বেঁটন করে রেখেছেন। যদিও আমরা ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু এটা এমন সত্য ও খাঁটি কথা যার সংবাদ স্বয়ং রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে প্রদান করেছেন। শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা সেসব ফেরেশতাদেরকে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রেখেছেন নতুবা একথা সত্য যে, এই মুহর্তে ফেরেশতারা যমিন থেকে আসমান পর্যন্ত আমাদেরকে ঘিরে রেখেছেন। এটা যেহেতু যিকিরের মজলিস তাই এই মজলিসে এরকম আদব ও ইহতিরামের সাথে বসা চাই যেমন বসা হয় নামাযের তাশাহুদে।

দাওয়াত তালীম তাবলীগ এসবই যিকিরের মজলিস হিসাবে গণ্য, অত্র যিকিরের মজলিসে আল্লাহর ভয় হল মুখ্য। যিকির যদি সম্মিলিত হয় তাহলে আল্লাহ তাআলাও ফেরেশতাদের সম্মিলিত মজলিসে বান্দাদের কথা আলোচনা করেন আর যিকির যদি একাকি হয় তাহলে আল্লাহ তাআলাও তাকে একাকী স্বরণ করেন।

এই জন্য আমার মোহতারাম দোস্ত বুয়ুর্গ! আমাদের এই বসে বসে কথা শোনা যেন আমাদের জীবনের মোড় পরিবর্তনের জন্য কারণ হয়ে যায়। আর এজন্য আমাদের অত্যন্ত মনোযোগের সাথে কথা শুনতে হবে। আমরা একটা ইবাদতের মধ্যে আছি এই একীনের সাথে এখানে বসতে হবে। তাহলে এই শোনা আমাদের জীবনে পরিবর্তনের কারণ হবে। নতুবা শুধু ভাষণ বক্তৃতা এগুলি দাওয়াতের মেযাজ নয়। দাওয়াতের মেযাজ হল ইসলামের নিসবতে একত্রিত হওয়া এবং ইসলামের নিসবতে ছড়িয়ে পড়া। তাই অত্যন্ত মনোযোগের সাথে কথা শুনতে হবে, আমলের নিয়তে এবং অন্যের নিকট পৌছানোর নিয়তে

জনতে হবে। কেননা এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত ও আমল সমান সমান করবে তার চেয়ে উত্তম ইসলামওয়ালা আর কেউ হতে পারে না। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছে

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَبِلَ صَالِحًا

উলামায়ে কেরাম বলেন, দাওয়াত আর আমল একত্রিত হলে সবচেয়ে উত্তম দ্বীনওয়ালা হয়ে যায় মানুষ। আমার কথা আপনাদের জন্য বোঝা যদিও একটু কষ্টকর হয়ে যাবে তবুও আমাকে এই জন্য বলতে হচ্ছে যে, যাতে আমাদের দাওয়াতের মেহনতে শক্তি এবং পরিপক্বতা পয়দা হয়।

*আমরা কেন দাওয়াত দেব? *

*কেন তালীম করব?

*উম্মতের মধ্যে এই নকল হরকতকে যেন জিন্দা করতে হবে?

*সর্বোপরী আমাদের জন্য এই কাজ করা কেন জরুরী?

এই জন্য আমি আরজ করতে চাচ্ছি যে, ইসলামের মধ্যে সৌন্দর্য্য পয়দা করার এটাই একটা রাস্তা। কেননা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ইরশাদ করেছেন “তার চেয়ে ভাল ইসলাম আর কার হতে পারে যে দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে আমলও করে”। আমাদের দাওয়াত দেয়ার বুনিয়াদ এটাই। শুধুমাত্র অন্যের এসলাহ মাকসুদ না বরং দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাথে নিজের সম্পর্ক মজবুত করা এবং ইবাদাতের মধ্যে পূর্ণতা আনয়ন করা, এটাই দাওয়াতের উদ্দেশ্য।

সুতরাং এই বুনিয়াদ যত মজবুত ও পোক্ত হবে তত উম্মতের মধ্যে আসবাবে তারবিয়ত ও আসবাবে হেদায়াত ব্যাপক হবে। কেননা দ্বীনের উপর ইস্তিকামাত এবং সর্ব প্রকার বাতিলকে মোকাবিলা করে দ্বীনের হেফাজতের এটাই একমাত্র রাস্তা যে, মুসলিম উম্মাহ দ্বীনের এই দাওয়াতের উপরে শতভাগ উঠে আসবে। উম্মত যদি অন্যকে দাওয়াত দেয়া পরিত্যাগ করে তাহলে অচিরেই এই উম্মত বাতিলের দাওয়াত ও মেহনতের শিকার হয়ে যাবে।

এব্যাপারে আমি আপনাদের খেদমতে হযরতজী মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) এর একটি কথা নকল করব। হযরত (রহঃ) বলতেন, এই উম্মত যখন দাওয়াতের আমল পরিত্যাগ করবে তখন তাদেরকে বাতিলের দিকে

দাওয়াত দেয়া হবে। কেননা উম্মত দুই অবস্থা থেকে একটি গ্রহণ করতে বাধ্য। হয়ত সে দাই হবে কিংবা মাদউ হবে। অর্থাৎ কেউ হয়ত আমাদেরকে দাওয়াত দেবে কিংবা আমরা কাউকে দাওয়াত দেব। যতদিন পর্যন্ত এই উম্মত দাওয়াতের মেহনতের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিল ততদিন পর্যন্ত তার। দ্বীনের উপর অটল এবং দ্বীনের হেফাজতের মধ্যে ছিল।

সুতরাং আজ আমাদেরকে গভীরভাবে এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে যে, যেকোন যুগে যে কোন জাতি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দাওয়াত ছাড়া অন্য কোন রাস্তা এই উম্মতের সামনে খোলা নেই। উম্মতের পরবর্তী অংশ যদি নিজেদেরকে শোধরাতে চায় তাহলে তাদেরকে ঐপথ ধরতে হবে যে পথে উম্মতের পূর্ববর্তীরা নিজেদেরকে শুধরে নিয়েছিলেন। উম্মতকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা যদি অন্যকোন পছা উদ্ভাবন করি তাহলে সেটা হবে নব্বী চিন্তাধারার পরিপন্থি। এর কারণে আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলব।

যে ব্যক্তি তিন দিনও সময় লাগিয়েছে তার অন্তরেও যেন একথা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, তারবিয়ত তাওয়াজ্জুহ, হেদায়াত এবং আল্লাহ পাকের যাতে সাথে সামান্যতম সন্দেহ যদি চলে আসে তাহলে দাওয়াতের আমল দ্বারা সে পরিপূর্ণ ফায়েদা হাছিল করতে পারবে না।

হযরতজী মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) বলতেন, এই কাজের সাথে আমাদের মুনাসবাত আছে কিনা তার আলামত হল কোনদিন যদি দাওয়াতের আমল ছুটে যায় তাহলে সেই দিনের ইবাদত বন্দেগী তার নিকট এত দুর্বল অনুভূত হতে থাকবে যেমন নাকি সময় মত খাদ্য গ্রহণ না করলে শারীরিক দুর্বলতা অনুভূত হয়। কেননা দাওয়াতের আমল অন্যান্য ইবাদতের জন্য শক্তি সঞ্চয়কারী যেমন খাদ্য শরীরে শক্তি সঞ্চয়কারী। একথার একীণ আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যেতে হবে, এই উম্মত যখন দাওয়াত ছেড়ে দেবে তখন তারা অন্যের দাওয়াতের শিকার হয়ে যাবে।

এই জন্য মোহতারাম দোস্ত-বুয়ুর্গ, আমি এখানে কিছু বুনিয়াদী কথা আরজ করতে চাই যা আমাদের অন্তরের গভীরে প্রোথিত হয়ে যাওয়া উচিত। সেটা হল উম্মতে দাওয়াত হোক কিংবা উম্মতে ইজাবাত হোক ক্ষতি থেকে বের হওয়ার জন্য সকলের সামনে একমাত্র এই দাওয়াতের

পথ খোলা রয়েছে। আল্লাহ পাক আল কুরআনে কসম খেয়ে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন -

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থাৎ সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। এই ক্ষতি থেকে বাঁচার চারটি আসবাব আছে। এই চারটি পরস্পরে সমান সমান গুরুত্ব বহন করে। এটা বলার কোন অবকাশ নেই যে, ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য একটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা কম গুরুত্বপূর্ণ বরং সবকটিই সমান গুরুত্ববহ। যেমন মানুষের জীবন ধারণের জন্য আগুন, পানি, বাতাস এবং খাদ্যের প্রয়োজন এগুলি ছাড়া জীবনের গাড়ি অচল। আল্লাহ তাআলা কসম খেয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

নাজাতের আসবাব চারটি জিনিষ

১। ঈমান আনতে হবে

২। নেক আমল করতে হবে

৩। অন্যকে ঈমানের দাওয়াত দিতে হবে।

৪। অন্যকে নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

যারা এই চারটি কাজ করবে তারাই নাজাত পাবে। নাজাতের আসবাব শুধুমাত্র দুটি নয় যে, ঈমান আনলাম এবং নেক কাজ করলাম বরং চারটি জিনিষ। এই চারটি মিলে নাজাতের কারণ হবে।

দোস্ত বুয়ুর্গ! আমরা উম্মতের প্রতিটি সদস্যকে এই জন্য দাওয়াতের কাজে লাগাতে চাই যাতে তারা দাওয়াতের মাধ্যমে নিজেরাও দ্বীনের উপর কায়ম থাকে। কেননা দ্বীনের উপর ইস্তিকামাত দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার দ্বারা বাকি থাকবে। সাহাবায়ে কেরামের সামনে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের চিত্র তখন যেভাবে ছিল আজও আমাদের সামনে ঠিক সেভাবেই রয়েছে, কিন্তু তারা সেসব বিলাস-ব্যসনকে লাখি মেরেছেন, দ্বীনের হেফাজত হবে বলে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর কোন একটা সুন্নতকে পরিত্যাগ করতে রাজি হননি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হযাফা কে বন্দী করা হল, রোম সম্রাট তাকে খৃষ্টান হওয়ার দাওয়াত দিল এবং বলল আমার অর্ধেক রাজত্ব তোমাকে দিয়ে দেব। উত্তরে তিনি বললেন তোমার আধা বাদশাহী না বরং তোমার

পূর্ণ বাদশাহী এবং সেই সাথে আরো বাদশাহী যদি আমাকে দিয়ে দাও তাহলে আমি চোখের পলক ফেলা সময় পরিমাণও আমার নবীর কোন সুলত ছাড়তে রাজি নই। এই উত্তর শুনে রোম সম্রাট তাকে উত্তম গরম পানিতে নিষ্কেপ করার পরিকল্পনা করল। পানির ডেগের কাছে হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে ছাফাকে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি ক্রন্দন করতে শুরু করলেন। বাদশাহ মনে করল তিনি হয়ত ভয় পেয়ে গেছেন, তাই আবার তাকে খুঁটি ধর্মের দাওয়াত দিল, তিনি ঘৃণাভরে উক্ত দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন আমি মৃত্যু ভয়ে ক্রন্দন করি নাই। বরং আমি তো এই আফসোসে ক্রন্দন করেছি যে, আল্লাহর রাস্তায় আমার মাত্র একটা জান কুরবান হচ্ছে এটাতো বড়ই নগণ্য কুরবানী। আমার শরীরে যতগুলি পশম আছে যদি ততগুলি জান হত আর একেকটি করে জান আমি আল্লাহর রাহে কুরবান করে দিতে পারতাম তাহলে আমার জীবনকে ধন্য মনে করতাম।

এ ধরনের ঘটনাতো আমরা অহরহ শুনে থাকি কিন্তু আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে, তাদের মধ্যে এ ধরনের যোগ্যতা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। আর আমাদের মধ্যে থেকে সে যোগ্যতা কিভাবে বিদায় নিয়ে গেল?

এটা এমন এক দাওয়াত যা এই উম্মতের যিম্মায় ফরজ

ইতিহাস সাক্ষী যে, মুসলমান যখন এই দাওয়াতকে ছেড়ে দিয়েছে তখন সর্ব প্রথম যে দুর্বলতা মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিয়েছে তাহল- এই দ্বীনকে তারা হালকা ভাবে গ্রহণ করেছে এবং দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করতে শুরু করেছে। উম্মত যখন ইজতিমায়ীভাবে দাওয়াত ইল্লাহ ছেড়ে দিয়েছে তখনই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে খুব ভালভাবে একথা অন্তরে বসিয়ে নিতে হবে যে, দাওয়াত ইল্লাহ উম্মতের সম্মিলিত যিম্মাদারী যেমন নাকি নামায় একটি সম্মিলিত ফরজ। একাকি আদায় করলে হবে না, অনুরূপভাবে দাওয়াতের মেহনতও এই উম্মতের যিম্মায় ফরজে আইন ফরজে কেফায়া নয়। আমি জানি যে, আমার এই বক্তব্য আপনাদের অনেকের নিকট অন্য রকম মনে হতে পারে, কেননা আমাদের চিন্তা চেতনায় তো একথা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, এই তাবলীগী জামাআত তো উম্মতের

সংশোধনের কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু বিষয়টি শুধু এই বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ব্যাপকভাবে উম্মতের এই কাজে না জোড়ার কারণ হল তারা, এটাকে ফরজে কেফায়া মনে করে বসে আছে। তারা মনে করছে সৎ কাজের আদেশ করা আর অসৎ কাজের নিষেধ করা একটা ভাল কাজ। যে কোন একটা দল এই যিম্মাদারী পালন করলে অন্য সকলের পক্ষ থেকেও তা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটি এমন নয়। এটা ফরজে আইন, ফরজে কেফায়া নয়। জানাযা, কাফন, দাফন ফরজে কেফায়া। কয়েক জনে পড়লে বাকিদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অন্যদের সংশোধনের জন্য এ দাওয়াত দেয়া ফরজে কেফায়া। কোন একটা জামাআত এই কাজ করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু তাবলীগের এই কাজ ফরজে কেফায়া না বরং ফরজে আইন। কেননা এই দাওয়াত তো অন্যের সংশোধনের জন্য না বরং এই দাওয়াতের মূল টার্গেট হল স্বয়ং দাঈ। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- **وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ**

যে ব্যক্তি মুজাহাদা করল যে নিজের জন্যই করল। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বীনের মেহনত সর্ব প্রথম তার নিজের জন্য। যেমন ঈমান শেখা ফরজে কেফায়া না বরং ফরজে আইন তাহলে ঈমান শেখা যখন ফরজে আইন তখন তার দাওয়াত দেয়াও ফরজে আইন।

হযরতজী মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) বলতেন, একীন তৈরী হওয়ার জন্য একমাত্র রাস্তা হচ্ছে দাওয়াত। এছাড়া আর কোন পথ নেই। এটা আমি এজন্য বলছি যে, তাবলীগের সাথীরা বর্তমানে হযরতজী ইউসুফ (রহঃ) এর বয়ান বুঝে বুঝে পড়ে না, হায়াতুস সাহাবা যেমন আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে পড়া দরকার তেমনটা দেখা যায়না। আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে, হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) এবং ইউসুফ (রহঃ) মজমার নিকট কি চাইতেন? তারা মজমাকে কিসের উপর উঠাতে চাইতেন। এখনতো আমাদের মজমার এই অবস্থা যে, তারা সব ধরনের কিতাব পড়ে যার ফলে তাদের চিন্তা চেতনা, ফিকির হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) এর ফিকির থেকে ভিন্নতর হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় মাসায়েলের কিতাব ছাড়া (কেননা এগুলিতো পড়তেই হবে) শুধুমাত্র তাদের বয়ানগুলি খুব মনোযোগের সাথে পড়া উচিত। যাতে করে আমরা আন্দাজ করতে পারি যে, তারা এই মেহনতকে কোন বুনিয়াদের উপর

পেশ করতে চাচ্ছিলেন। দাওয়াততো নিজের জন্য, তাইতো হযরতজী (রহঃ) বলতেন, যে জিনিষটা তোমরা নিজের মধ্যে পয়দা করতে চাও সেটাকে তাবলীগের নিয়তে কর। অর্থাৎ নিজের মধ্যে ফিকির পয়দা করার জন্য অন্যকে দাওয়াত দাও। এটা হল আব্বাহ পাকের কানুন। তিনি ওয়াদা করেছেন যে, যে ব্যক্তি আমার জন্য মেহনত করবে আমি অন্যদের দেয়ার পূর্বে তাদেরকে দেব। যে আমার বান্দাদেরকে আমার দিকে ডাকবে আমি সর্ব প্রথম তাকেই ঐ জিনিষ দ্বারা ভূষিত করব।

এই জন্যই আমার দোস্ত বুয়ুর্গ! ঈমান শিখা ফরজে আইন। এবং এই পরিমাণ ঈমান শেখা ফরজে আইন যা মুমিনকে হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে। এলেম দাওয়াতের বুনিয়াদী বিষয়। ঈমানের দাওয়াতের এই মেহনত সমস্ত আখিয়ায়ে কেরামকেও দেয়া হয়েছিল। মাসায়িলের ক্ষেত্রে যদিও কম-বেশি এবং পার্থক্য ছিল কিন্তু ঈমানের মেহনত সকলের জন্য মুশতারাক ছিল।

হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) বলতেন, আমি যদি এই কাজের কোন নাম রাখতাম তাহলে তা হত তাহরীকে ঈমান অর্থাৎ ঈমানী আন্দোলন। কেননা ঈমান শেখা ফরজে আইন। যেহেতু মুসলমানের মধ্যে থেকে ঈমান শেখার এই রেওয়াজ খতম হয়ে গেছে তাই তাদের ধারনায় একথা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, ঈমানের দাওয়াততো অমুসলিমের জন্য আর আমরাতো ঈমানওয়ালা, আমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজন কি? অথচ বিষয়টি এমন নয় বরং ঈমানের দাওয়াত তো স্বয়ং মুমিনের জন্য। আব্বাহ পাকের নির্দেশও এটাই।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا : হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আনয়ন কর। উলামায়ে কেরাম এই আয়াতের তাফসীর এভাবে করেছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুসলমান হয়ে থাক। এই ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা গেল যে, ঈমানের দাওয়াত স্বয়ং মুমিন ব্যক্তির জন্যই। বিশ্বাস না হয় সাহাবায়ে কেরামের কথাই চিন্তা করে দেখুন। তাদের অন্তরে ঈমান ছিল পাহাড়ের মত মজবুত এতদসত্ত্বেও তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল ঈমানকে নবায়ন করার। নতুবা ঈমান পুরাতন কাপড়ের মত পুরাতন হয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম যারা-

*ওহী অবতীর্ণ হতে দেখছিলেন

*ফেরেশতাদের অবতরণ প্রত্যক্ষ করছিলেন

*গায়েরী সাহায্যও দেখছিলেন

*আল্লাহর ওয়াদা পূরণ হচ্ছিল

*তাদের ঈমানে ক্রমশ তারাকী হচ্ছিল

মোট কথা ঈমান মজবুত হওয়ার যত পছন্দ ছিল তার সবই সাহাবায়ে কেরামের সামনে ছিল, যার কোনকিছু আমাদের সামনে নেই-এতদসত্ত্বেও তাদের জন্য নির্দেশ ছিল "তোমরা ঈমানের তাজদীদ করতে থাক", কেননা ঈমান এরকম পুরানো হয়ে যায় যেমন কাপড় পুরাতন হয়ে যায়।

আজকে আমরা যারা বলছি আমাদের তো ঈমান আছে, আমাদেরকে দাওয়াত দেয়ার কি প্রয়োজন- তাদেরকে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে যে, আমাদের ঈমান কি সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের চেয়ে বেশি মজবুত? সাহাবায়ে কেরামের ঈমানকে তো আমাদের জন্য নমুনা হিসাবে পেশ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : **أَمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ** -সাহাবাদের মত ঈমান শেখ, তাদের ঈমান তোমাদের জন্য নমুনা। সেই সাহাবায়ে কেরামকেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঈমান নবায়ন করার। তারা আরজ করলেন ইয়া রাসুল্লাহ! আমরা কিভাবে ঈমান নবায়ন করব? আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করলেন, বেশি বেশি **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** বলার দ্বারা ঈমানকে নবায়ন করতে থাক।

যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নিকট আশা করবে আল্লাহ তাআলা তাকে গায়রুল্লাহর সোপর্দ করে দেবেন

এখন প্রশ্ন হল বেশি বেশি কালেমা পড়ার দ্বারা উদ্দেশ্য কি? তো খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, বেশি বেশি পড়ার দ্বারা শুধু মাত্র কালেমার যিকির উদ্দেশ্য না, বরং বেশি বেশি পড়ার দ্বারা ঈমান তাজা হওয়ার উদ্দেশ্য হল, দুনিয়াদার লোকেরা যেমন বেশি বেশি গায়রুল্লাহ থেকে হওয়ার কথা আলোচনা করতে থাকে তেমন তুমিও আল্লাহ পাকের যাত থেকে বেশি বেশি হওয়ার কথা বলতে থাক। এটাই হচ্ছে বেশি বেশি কালেমা পড়ার দ্বারা ঈমান তাজা হওয়ার মতলব।

পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা হল আমরা যারা দিনে ৫/১০ মিনিট হয়ত কালেমার যিকির করি অতঃপর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের মুখে-সরকার এই করবে

রাষ্ট্র এই করবে
মন্ত্রী এই করবে
প্রেসিডেন্ট এই করবে
অমুক রাষ্ট্র এই করবে
অমুক রাষ্ট্র এই অস্ত্র বানিয়েছে
এইসব শিরকী কথা জারী থাকে।

চোখ বড় বড় করে পত্রিকা পড়ি আর অন্যকে শোনাই। কুরআনের খবরের উপর যতটা না একিন আছে তার চেয়ে বেশি একিন পত্রিকার খবরের উপর। এই জন্যই অন্যকে পড়ে পড়ে শোনাই। আল্লাহ তাআলা তো মানুষের অন্তরের প্রভাবান্বিত হওয়া দেখেন। আর আল্লাহ তাআলার নিয়ম হল, যে গায়রুল্লাহর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় আল্লাহ তাআলা তাকে গায়রুল্লাহর সোপর্দ করে দেন। এটা হাদীসের কথা। রাসূলে আকরাম (সালামুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর কাছে আশা রাখে আল্লাহ পাক তাকে গায়রুল্লাহর সোপর্দ করে দেন।

সুতরাং আমাদেরকে খুব ভালভাবে অনুধাবন করতে হবে যে, এই হাদীস দ্বারা শুধুমাত্র লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশি বেশি যিকির করা উদ্দেশ্য নয়। যিকিরের ফযীলত তো যথাস্থানে ঠিক আছে তাতে কারো কোন দ্বিমত নেই কিন্তু গায়রুল্লাহ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি অস্ত্র থেকে বের করে আল্লাহ পাকের যাতের বড়ত্ব, তার কুদরত, তার আযমত অস্ত্র রে বসানো হচ্ছে মূল বিষয়। সুতরাং কালেমার যিকির তো করতেই হবে সাথে সাথে কালেমার যে মতলব তারও দাওয়াত দিতে হবে। কেননা হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, তোমরা কালেমা **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** এর এই পরিমাণ যিকির কর যে, লোকেরা তোমাকে পাগল বলতে থাকে। আমি এই হাদীসের মতলব নিয়ে খুব চিন্তা ফিকির করলাম যে, যিকির কারীকে পাগল বলার কি মতলব হতে পারে? তখন বুঝে আসল যে, নবীদেরকে এই জন্যই পাগল বলা হত যে, নবীরা তাদের স্ব জাতির আকিদা বিশ্বাসের পরিপন্থি হিসেবে এই কালেমাকে পেশ করতেন। এই জন্যই কওমের লোকেরা তাদেরকে পাগল বলত।

কওমে শুআইবের ধারণা ছিল ব্যবসা দ্বারা সব কিছু হয়

কওমে সাবার ধারণা ছিল কৃষি দিয়ে সব কিছু হয়

কওমে সালেহর একিন ছিল কারখানা দ্বারা সব কিছু হয়
ফেরাউনের ধারণা ছিল আমার (বাদশাহী) দ্বারা হয়
নমরুদের ধারণা ছিল মাল দ্বারা হয়।

আম্বিয়ায়ে কেরাম এসে এসব ধারণার পরিপন্থি আকীদা বিশ্বাস তুলে
ধরলেন যে, **أَلَا يُؤْمِنُ** অর্থাৎ কিছু থেকে কিছু হয়না সবকিছু আল্লাহ
থেকে হয়। এই জন্যই তারা নবীদের কে পাগল বলতে শুরু করল,
কোন নবী এমন অতিবাহিত হননি যাকে তার কওম পাগল বলেনি।

কি ভাই! আমার কথা আপনাদের বুঝে আসছে? দেখুন আমি কিন্তু
কোন ওয়াজ করতে বসি নাই, আমি তো একথাই চিন্তা করছি যে,
আমাদের মজমা প্রতিদিন আল্লাহ তাআলার তাওহীদের কথা, আল্লাহ
তাআলার কুদরতের কথা বেশি বেশি বলার প্রয়োজন কেন অনুভব করছে
না? এর মূল কারণ হল সাহাবায়ে কেরামকে ঈমান নবায়ন করার নির্দেশ
দেয়ার পরে তারা এর জন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, কিভাবে
তারা ঈমানের তাজদীদ করেছিলেন! সেটা আমাদের জানা নেই।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ঈমান মজবুত করা সম্বন্ধে যে বাব বেদেছেন
সেখানে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে,
তিনি লোকদেরকে মসজিদে নিয়ে এসে তাদেরকে তাওহীদের কথা
শেখাতেন, গায়েবের কথা আলোচনা করতেন আর লোকদেরকে বলতেন
আস অল্প সময় বসে ঈমান শেখ। কিন্তু আমরাতো দাওয়াতের কাজকে
এমনভাবে ভুলে বসে আছি যে, সাহাবারা যে কাজ করেছেন তার উপর
আমাদের প্রশ্ন হয়। অথচ সাহাবায়ে কেরামের ঈমান কত মজবুত ছিল।
এক হযরত উসমান (রাঃ) এর ঈমান এত মজবুত ছিল যে, বিশাল এক
বাহিনীর উপর যদি সেটা বন্টন করে দেয়া হত তাহলে তাদের জন্য
যথেষ্ট হয়ে যেত।

একবার হযরত উসমান (রাঃ) এর পাশ দিয়ে হযরত উমর (রাঃ)
অতিক্রম করছিলেন তখন তার নিকট বসে থাক। লোকদেরকে তিনি
বললেন, তোমাদের সাথে যিনি বসে আছেন তিনিতো সেই ব্যক্তি যে,
তার ঈমান যদি বড় একটা বাহিনীর উপর তাকসীম করে দেয়া হয়
তাহলে এই ঈমান তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। সাহাবায়ে
কেরামের ঈমান এই পর্যায়ে থাকার পরও তাদের জন্য নির্দেশ ছিল
তোমরা ঈমানকে তাজা করতে থাক।

সুতরাং আপনাদের নিকট আমার আরয় হল, আমরা যেন প্রতিদিন মসজিদে ঈমানের হালকা কায়েম করি। এটা হচ্ছে মসজিদ আবাদের প্রথম আমল। এটা সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত। তারা পরস্পরকে দাওয়াত দিতেন- **اجلس بنا تؤمن ساعة**। আস ভাই বস, অল্প সময় ঈমান শিখি। হযরত মুআয ইবনে জাবাল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রহঃ) উচু দর্জার সাহাবী ছিলেন। কিন্তু তাদের প্রতিদিনের অভ্যাস ছিল তারা লোকদেরকে নিয়ে মসজিদে ঈমানের হালকা কায়েম করতেন। উম্মতের মধ্যে থেকে এখন ঈমানের দাওয়াত খতম হতে বসেছে। অথচ এটাই ছিল ঈমান মজবুত করার মাধ্যম। ফলে এর প্রভাব সমস্ত দ্বীনের উপর পড়েছে। কেননা যে পরিমাণ ঈমান না থাক সেই পরিমাণ ইসলাম আসবে। ঈমানের অবস্থা অনুযায়ী আল্লাহ পাকের আনুগত্য আসবে।

হাদীসের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহর আনুগত্যর ক্ষেত্রে মুমিনের অবস্থা হল লাগাম পরানো উটের মত। সুতরাং মুসলমান যদি মনে করে আমরা তো জন্ম থেকেই ঈমানদার কাজেই আমাদের আবার ঈমান শিখতে হবে কেন? তাহলে এটা হবে বড়ই ভুল সিদ্ধান্ত। শরীর থেকে জামা খুলতে যতটুকু সময় লাগে এর চেয়ে দ্রুত মানুষের দিল থেকে ঈমান বের হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান যখন কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয় তখন ঈমানের নূর তার দিল থেকে বের হয়ে তার মাথার উপর চলে আসে। অতঃপর তাওবা না করা পর্যন্ত এই নূর আর ফিরে যায় না। আর আমরা তো কবীরা গোনাহটাই জানি না। তাহলে ঈমানের খবর থাকবে কিভাবে?

আহকামের ইলম আমল করার জন্য

এই জন্যই মোহতারাম দোস্ত বুয়ুর্গ! আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** কে দাওয়াতের মধ্যে আনতে হবে। আর এটাকে দাওয়াতে আনার জন্য সর্ব প্রথম কাজ হল প্রতিদিন আল্লাহর তাওহীদকে, আল্লাহর কুদরতকে, আল্লাহর রব হওয়াকে, তার বড়ত্বকে এবং তার গায়ের থেকে কিছুই হয়না এই কথাগুলি বেশি বেশি বলতে থাকতে হবে। আমাদের গাশতের এটাই হল বুনিয়াদী সম্পদ। উলামায়ে কেরাম বলেন, আহকামাতের ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্য হল তার উপর আমল করা।

নামাযের ইলম হাসিল করে সেই মত নামায আদায় করলে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি হাসিল হয়ে গেল। কিন্তু মুমিনের জন্য আল্লাহর তাওহীদ থেকে কোন ছুটি নেই। অর্থাৎ এই কথা বলার সুযোগ নেই যে, আমরা আল্লাহকে এক বলে জানলাম আর ছুটি হয়ে গেল। বরং প্রতিদিন আল্লাহ পাকের তাওহীদের কথা বলতে থাকতে হবে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَخِدُوا اللَّهَ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তাওহীদের কথা বলতে থাক কেননা, সমস্ত নেকীর ভিত্তিই হচ্ছে তাওহীদ।

কেননা আমলের মধ্যে ইখলাস

আমলের উপর ইস্তিকামাত

আমলের মাধ্যমে ওয়াদা পূরণ হওয়া

আমলের দ্বারা বিনিময় পাওয়া

প্রত্যেক আমলের সাথে এই চারটি বুনয়াদী জিনিষ থাকে। আর এই চারটি জিনিষ ঈমান ছাড়া হাসিল হয় না।

ওয়াদা একিনের দ্বারা পূরণ হবে

ইস্তিকামাত একিন দ্বারা হাসিল হবে

বিনিময়ও একিন দ্বারাই হাসিল হবে

আর ইখলাসও ঈমানের পরিমাণ মত হাসিল হবে।

ঈমান মজবুত হবে চারটি জিনিষ দ্বারা

ঈমান মজবুত হওয়ার প্রথম বিষয় হল, প্রতিদিন আল্লাহ পাকের তাওহীদের কথা বেশি বেশি বলতে হবে যে, করনে ওয়ালা যাত একমাত্র আল্লাহ। গায়রুল্লাহ থেকে কিছু হয় না। আল্লাহর কুদরত আল্লাহ পাকের যাতে মধ্যে নিহিত। ফেরেশতা, নবী কিংবা ওলীর মধ্যে এই কুদরতকে রাখা হয় নি। মানুষ যখন এসব জিনিষের মধ্যে কুদরতের কল্পনা করে তখন এই কল্পনাই তাকে গায়রুল্লাহর দিকে নিয়ে যায়। হযরতজী মাওলানা ইউসুফ (রহ.) বলতেন, মানুষ যখন ঈমানের দাওয়াত পরিত্যাগ করবে তখন একিন নিজের আমলের উপর থেকে হটে অন্যের আমলের উপর নিবদ্ধ হবে। তারা বলবে অমুক বুয়ুর্গ দ্বারা এটা হবে। মন্ত্রী দ্বারা এটা হবে, প্রেসিডেন্ট দ্বারা এটা হবে। অথচ করনে ওয়ালা যাত শুধুমাত্র আল্লাহ। আল্লাহর গায়ের থেকে কিছুই হয় না। নবীও যদি

এরকম বলেন যে, কালকে এই কাজটা করব আর ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে যান তাহলেও আল্লাহ পাক তার মদদ উঠিয়ে নেন। অথচ ইচ্ছাকৃতভাবে ইনশাআল্লাহ বলেন নি তা নয় বরং ভুলে গেছেন। তারপরেও এই অবস্থা। তাহলে আমরা তো প্রতিদিন আমাদের মুখ দিয়ে কতকিছু দাবী করছি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা এই করব, সরকার এই করবে, ব্যবসায়ী এই করবে, ডাক্তার এই করবে, কিন্তু ইনশাআল্লাহ বলি না। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাত্র একবার বলেছিলেন, কালকে আমি তোমাদেরকে জানাব যে, আসহাবে কাহাফ কারা ছিল। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। উলামায়ে কেরাম বলেন, এই কারণে ১৫দিন পর্যন্ত অহী আসা বন্ধ ছিল। অথচ ইতিপূর্বে এত লম্বা সময় কখনো অহী বন্ধ থাকে নি। লোকেরা এই নিয়ে সমালোচনা করতে থাকল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত পেরেশান হয়ে গেলেন। অতঃপর ১৫দিন পরে অহী নাযিল হল- وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ...

অর্থাৎ হে নবী! আপনি ভবিষ্যতে আর কখনো ওরকম বলবেন না যে, আগামী কাল আমি এরকম করব। যতদিন পর্যন্ত আপনি আপনার কথাকে আমার যাতের সাথে সম্পৃক্ত না করেন, যখনই ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে যাবেন তখন অবশ্যই ইনশাআল্লাহ বলে নেবেন।

তো আমি যে কথা আরয় করছিলাম আমার দোস্ত বুয়ুর্গ যে, কুদরত আল্লাহ পাকের যাতের মধ্যে নিহিত। আন্খিয়ায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে কেরাম, ফেরেশতা জিবরাইল আ. সকলেই মুহতায়-মুখাপেক্ষী। নবীকে যে কাজের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে তাতেও তিনি মুখাপেক্ষী, স্বাধীন নন যে, যাকে মন চায় হেদায়াত দান করবেন। অথচ নবীদেরকে তো হেদায়াতের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু তারা নিজের থেকে কাউকে হেদায়াত দিতে পারেন না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের চাচা আবু তালেবের হেদায়াতের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন আর অন্য চাচা হযরত হামযার হত্যাকারী ওয়াহশী কে হত্যা করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেই ওয়াহশীকেই হেদায়াত দিয়েছেন আর আবু তালেব হেদায়াত ছাড়াই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন।

হযরত জী (রহ.) বলতেন, আঘিয়ায়ে কেরাম এবং সাধারণ মানুষের ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায় যাতে তারা আল্লাহকে চিনতে পারে। হযরত আলী (রা.) বলতেন, আমি আমার ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ হয়েই আল্লাহকে চিনেছি। যারা আসবাবের উপর একিন রাখে তারা যখন ব্যর্থ হয় তখন আসবাবের দুর্বলতা আর কমি তালাশ করতে লেগে যায়। আর যারা আল্লাহর সত্ত্বার উপর একিন রাখে তারা নিজেদের ব্যর্থতায় আল্লাহর পরিচয় খুঁজে পায়। তারা আল্লাহর দিকে রুজু করে যে, আল্লাহই কাজকে ব্যর্থ করেছেন এখন তিনিই তা শুধরে দেবেন। এভাবে আসবাবের নাকামী তাদেরকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়। আর যারা বস্ত্ববাদে বিশ্বাসী তারা ব্যর্থ হলে আত্মহত্যা করে বসে যে, এতকিছু করলাম তারপরও কাজ উদ্ধার হল না।

এই জন্য সব সময় মনে রাখতে হবে যে, কুদরত আল্লাহ পাকের যাতে মধ্য নিহিত। কায়েনাতে মধ্য কোন কুদরত নেই। কায়েনাত তো কুদরত দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে কুদরতের অনুগত হয়ে গেছে। আসমান-যমীনের মধ্যে যত জিনিষ আছে সব আল্লাহকে চেনার জন্য। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এই বাহ্যিক নেয়াম বানিয়েছেন বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য যে, বিশ্ব চরাচরের এই পরিবর্তন বান্দাকে আমার দিকে আনে নাকি আমার গায়েরের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, আজ মুসলমান চলছে বিজ্ঞানীদেরকে দেখে। বিজ্ঞান কি বলে তার উপর মুসলমানের চরম বিশ্বাস। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শিরক হল এই বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা যা দাজ্জালের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে।

বিজ্ঞানের মূল কথা হল গায়রুল্লাহর মাধ্যমে দুনিয়াতে এই পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বিজ্ঞানে এটাই পড়ানো হয় যে, এর কারণে এই হয়েছে ঐ জিনিষের কারণে এটা হয়েছে। আল্লাহর কসম করে বলছি, বিজ্ঞানে গায়রুল্লাহ দ্বারা হওয়ার কথাই শেখানো হয়। তারা জানেনা আল্লাহ কে? এই কায়েনাতে নেয়াম কি? মহাশূন্য কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে? এ সবার কিছুই তারা জানে না। তারা তো বস্ত্ববাদে বিশ্বাসী। আসবাব থেকে হওয়ার একিন তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে আছে। এটাই হল সবচেয়ে বড় শিরক।

খুব ভালভাবে মনে রাখবেন কায়েনাতে নেয়ামকে কায়েনাতে সাথে জুড়ে দেয়াটাই শিরক। পক্ষান্তরে নেয়ামে কায়েনাতকে খালেকে

কায়েনাত তথা সৃষ্টিকর্তার সাথে জুড়ে দেয়ার নাম হচ্ছে ঈমান। আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে আজ আমরা এই সব শিরকী কথাবার্তা শেখাচ্ছি। তাদের প্রতি আমাদের সামান্য দয়াও আসে না। বাচ্চাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বৃষ্টি কখন হয় তখন তারা বিজ্ঞানের শেখানো বুলি আওড়াতে থাকে।

হায় হায়! আমরা কোথায় যাচ্ছি? আমাদের মজমা কোথায় যাচ্ছে? প্রতিদিন যদি তাওহীদের কথা না বলি তাহলে এভাবেই শিরক আমাদের মধ্যে তার ডালা-পালা বিস্তার করতে থাকবে। তাই সর্বদা এই কথারই জোর লাগাতে হবে যে, গায়রুল্লাহ থেকে কিছুই হয় না সব কিছু আল্লাহ থেকে হয়, এটাই নবীদের দাওয়াত। এটাকেই আমাদের দিলে বসাতে হবে তাহলে আমাদের দিলের চোর দূর হবে। তাওহীদ আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে।

সাহাবায়ে কেরামের জন্য জেলখানায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে

সাহাবায়ে কেরাম যখন শতভাগ আল্লাহর হুকুমের উপর উঠেছেন তখন আল্লাহ তা'আলা সর্বক্ষেত্রে তাদেরকে মদদ করেছেন। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজর ইবনে আদী (রা.) একবার এক প্রকোষ্ঠে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। সেখানে ফরজ গোসলের প্রয়োজন দেখা দিল। যে তার পাহারায় নিয়োজিত ছিল তার নিকট পানি চাইলে সে পানি দিতে অস্বীকৃতি জানাল। তখন তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে আল্লাহর নিকট পানির জন্য দু'আ করলেন। দু'আর সাথে সাথে এক খণ্ড মেঘ তার বদ্ধ কামরায় প্রবেশ করে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করল। তিনি গোসল করলেন এবং প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করে রাখলেন। কোন বিজ্ঞানী কি এটা বিশ্বাস করবে? তারা তো বলে সমুদ্র থেকে মেঘ তৈরী হয় আর এত উপরে উঠে বর্ষিত হয়। তারা তো আল্লাহকেই চেনে না। তারা মনে করে আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করে অবসর নিয়ে নিয়েছেন এখন দুনিয়াতে যা কিছু হচ্ছে সব আটোমেটিক হচ্ছে, এই ধারণাটাই হল নাস্তিকতা। নিজেরাও এসব পড়ছি আর বাচ্চাদেরকেও এসব পড়াচ্ছি।

এই জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বাত্মে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। হৃদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃষ্টি হওয়ার

পূর্বেই সাহাবায়ে কেরামকে সতর্ক করে বললেন যে, তোমরা সকালে ঘুম থেকে উঠবে তখন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মুমিন থাকবে আর কেউ কেউ কাফের হয়ে যাবে। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম ঘাবড়ে গেলেন। কেননা, এটা কোন মামুলী কথা নয়। কেননা, তারা তো কুফর পরিত্যাগ করেই ঈমানে দাখিল হয়েছিলেন তাহলে সকালে আবার কাফের হয়ে যাওয়ার কি মতলব। তাই সাহাবায়ে কেরাম আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এটা কিভাবে সম্ভব? রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দিয়ে ইরশাদ করলেন, সকালে উঠে যারা বলবে অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে সে আল্লাহকে অস্বীকারকারী হল, তারকার উপর তার বিশ্বাস জন্মাল। আর যে বলবে আল্লাহই বৃষ্টি দিয়েছেন সে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী বলে গণ্য হবে। এভাবেই রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে ঈমান শিখিয়েছেন। এই জন্যই সাহাবায়ে কেরাম বলতেন যে, আমরা সর্ব প্রথম ঈমান শিখেছি তারপরে কুরআন শিখেছি।

খুব ধ্যানের সাথে কথা শুনি ভাই। আসমান-যমীনের এই যে নেয়াম এটা তো শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য যে, তোমরা এই নেয়াম দেখে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। কেউ যদি নেয়ামে কায়েনাতকে সব কিছু মনে করে তাহলে তো শিরকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেল। আর যারা খালেকে কায়েনাত তথা সৃষ্টিকর্তাকে সব কিছু মনে করে, মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর যাতাই সব কিছু করেনে ওয়ালা, মাখলুকের কোন ক্ষমতা নেই। তাহলে সেই প্রকৃত মুমিন।

যখন কোথাও ভূমিকম্প হয় তখন লোকেরা বৈজ্ঞানিকদের জিজ্ঞাসা করে এখানে ভূমিকম্প হওয়ার কারণ কি? একশত বছর আগে তো এখানে কোন ভূমিকম্প হয়নি। তারা এর উত্তরে হাজার রকম কারণ দেখাবে। কিন্তু আপনি যদি প্রথমেই এই কথা চিন্তা করেন যে, এই যমীন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন তার হুকুমেই এই যমিন পরিচালিত হয়। এই যমিনের উপর যখন যিনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পায় তখন আল্লাহর হুকুমে সেটি নড়ে ওঠে আর এটাই হল ভূমিকম্প। কেননা যমিন হল আল্লাহর একটা মাখলুক, সেই মাখলুক আল্লাহর নাফরমানী বরদাশত করতে পারে না। একথা চিন্তা করলে নিজেও আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা সহজ। কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা শুনলে নিজের মধ্যে পরিবর্তনের

কোন চিন্তা আসবে না। সবকিছুই মনে হবে প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত হচ্ছে। সুতরাং নিজের মধ্যে অনুশোচনা আসবে না। তাওবা করার জন্য কোন মানসিক চাপ সৃষ্টি হবে না। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনি ভাই। আমরা সকলেই বস্ত্রপুজার দিকে ধাবিত হচ্ছি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাফ করেন। এটাই সত্য কথা যে, আমরা আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে মাখলুকের ইবাদতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছি। এর কারণ হল প্রতিদিন তাওহীদের কথা উচ্চারণ করাকে আমরা আমাদের কাজ মনে করছি না। আমাদের সকলের চিন্তা চেতনায় একথা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, তাবলীগের দ্বারা কিছু আমল হয়ে যায়। সেই আমলগুলি করতে পারলেই যথেষ্ট। অথচ হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলতেন, আমি যদি এই কাজের কোন নাম রাখতাম তাহলে তাহত ঈমানী আন্দোলন। কেননা, মুসলমানদের মধ্যে ঈমান শেখার শাওক পয়দা করতে হবে যাতে প্রতিটি মুসলমান নিজের ঈমানের ব্যাপারে ফিকিরবান হয়ে যায়।

এখন আমরা নিজেরাই চিন্তা করি যে, যে ব্যক্তি নেয়ামে কায়েনাত দ্বারা প্রভাবিত সে ব্যক্তি আল্লাহর আহকামের উপর কিভাবে চলবে?

এতক্ষণ যাবত আমি আপনাদের সামনে ঈমান মজবুত করার প্রথম বিষয়টির কথা আরজ করলাম যে, আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা খুব বেশি বেশি বলতে হবে। এই কায়েনাত আল্লাহ পাকের কুদরত দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটি প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর কুদরতের অনুগত। আল্লাহ তাআলা চন্দ্র-সূর্যকে শুধুমাত্র এই কারণেই আলোহীন করে দেন যাতে মানুষ বোঝে যে তার আলোও আল্লাহর কবজায়।

যারা একথা মানেনা তারাই সূর্যের পূজা করে। কেননা তারা মনে করে সূর্যের এই আলো তার নিজের। এই জন্যই আমাদের প্রতিদিনকার প্রথম কাজ হবে আল্লাহর এই কুদরতের কথা বলতে থাকা। আমি নিয়ামুদ্দীনে সব সময়েই বলে থাকি যে, আমাদের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমান ভাইদের সাথে মুলাকাত করে তাদেরকে মসজিদের পরিবেশে নিয়ে আসা। তাদের সাথে মুলাকাত করে বলতে হবে ভাই! মসজিদে ঈমানের হালকা জারী রয়েছে আপনিও তাশরীফ নিয়ে চলুন। দশ মিনিটের জন্য হলেও চলুন। খুব ভাল করে মনে রাখতে হবে আমাদের মুলাকাতের উদ্দেশ্য হল নগদ নগদ মসজিদে নিয়ে আসা, এটা হল সাহাবায়ে কেরামের প্রথম সুন্নত যে, লোকদের সাথে সাক্ষাত করে

তাদেরকে ঈমানী মজলিসে বসাও, মসজিদে বসে আল্লাহর কুদরত, তার আযমত তার রব হওয়ার কথা, তার তাওহীদের কথা শোন এবং শোনাও। অতঃপর ওখান থেকেই এই দাওয়াতকে নিয়ে সমস্ত বস্ত্রবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোল যে, করনেওয়ালা যাত শুধুমাত্র আল্লাহ, গায়রুল্লাহ থেকে কিছুই হয় না।

মসজিদ আবাদের বুনিয়াদ হচ্ছে মসজিদে ঈমানী হালকা কায়েম করা

আমি তো নিযামুদ্দীনে বিভিন্ন রাজ্যের সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করে থাকি যে, বল ভাই তোমাদের মসজিদগুলোর মধ্যে কতগুলি মসজিদ মসজিদে নব্বীর আমল দ্বারা আবাদ আছে? অর্থাৎ মসজিদে ঈমানী হালকা কায়েম আছে আর সাথিরা মুলাকাত করে করে লোকদেরকে মসজিদের পরিবেশে নিয়ে আসছে? কেননা মসজিদ আবাদের মূল বুনিয়াদই হল মসজিদে ঈমানী হালকা কায়েম করতে হবে।

একদিকে ঈমানী হালকা কায়েম থাকবে

আরেক দিকে তালীমের হালকা কায়েম থাকবে

আর মুলাকাত করে করে লোকদেরকে মসজিদে হাজির করা হবে। সাথিরা যদি প্রতিদিন এভাবে ঈমানের হালকা কায়েম না করে তাহলে বাইরের পরিবেশের প্রভাব তাদের অন্তরে অবশ্যই পড়বে। সুতরাং তাওহীদের দাওয়াতকে জরুরী মনে কর যাতে করে আমাদের একিন আল্লাহর পাকের দিকে ধাবিত হয়। নতুবা গায়রুল্লাহ থেকে হওয়ার একিন দিলের মধ্যে বসে যাবে। আর এটাই হচ্ছে সমস্ত ধ্বিনের মূল।

কতবড় পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমান আজ বসে বসে চিন্তা করে যে, শরীয়তের এই হুকুমের বিরুদ্ধে যদি সরকারী কোন কানুন জারী হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করব? শরীয়ত বিরোধী কোন কানুনের কথা চিন্তা চেতনায় স্থান দেয়াও তো ঈমান পরিপন্থি। কেন আমরা এই চিন্তা করতে যাব? আমরা যদি শরীয়তের সমস্ত হুকুমকে যথাযথ ভাবে আঁকড়ে ধরি তাহলে তো কেউ এর বিরুদ্ধে কানুন করতে সাহস পাবে না। ইসলামী কানুনের উপর হস্তক্ষেপ করার ধৃষ্টতা দেখায় যখন স্বয়ং মুসলমানরা তার উপর আমল করা ছেড়ে দেয়। উক্ত কানুনকে বিকৃত করেছিল দুশমনরা

তো বিকৃত বিধানকেই মিটানোর জন্য চেষ্টা করে। নতুবা স্বীনে ইলাহীর উপর হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস কে দেখাতে পারে? মুসলমান যদি আরকানে ইসলামের উপর আবদ্ধ হয় তাহলে কারো শক্তি নেই তার দিকে চোখ তুলে তাকায়, মোহতারাম দোস্ত-বুয়ুর্গ! উম্মতে মুসলিমা দাওয়াত ছেড়ে দেয়ার কারণে আজ আযান নিয়েও কথা উঠতে শুরু হয়েছে। এই দাওয়াতের আমল ছেড়ে দেওয়ার কারণেই এটা হয়েছে। গায়রুল্লাহর প্রভাব প্রতিপত্তি অন্তরের মধ্যে যে পরিমান থাকবে গায়রুল্লাহ তার উপর সেই পরিমাণই চেপে বসবে। হযরত জী মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) এর কথা দিয়ে আমি প্রথম প্রকারের বয়ান শেষ করছি যে, আমাদের প্রতিদিনকার কাজ হল আমরা মানুষদেরকে মসজিদে নিয়ে এসে আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা, বড়ত্বের কথা বলতে থাকব, এটা সাহায্যে কেরামের সুনত।

ঈমান মজবুত হওয়ার দ্বিতীয় বিষয়

ঈমান মজবুত করার দ্বিতীয় সবব বা কারণ হল, আশ্বিয়ায়ে কেরামের সাথে যেসব গায়েবী মদদ সংঘটিত হয়েছে সেগুলি বেশি বেশি আলোচনা করতে থাকা। আল্লাহ তাআলা নিজেই ইরশাদ করেছেন,

হে নবী! আপনার দিলকে মজবুত করার জন্য আমি আপনার নিকট পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনা বর্ণনা করছি। (সূরায়ে হুদ-১২০) সুতরাং বুঝা গেল আশ্বিয়ায়ে কেরামের সাথে সংঘটিত গায়েবী মদদের কথা আলোচনা করা দিল মজবুত হওয়ার কারণ। কাজেই ঈমানী মজবুতী হাসিল করার এটাও একটা মাধ্যম।

ঈমান মজবুত হওয়ার তৃতীয় মাধ্যম

ঈমান মজবুত হওয়ার তৃতীয় সবব বা মাধ্যম হল সাহায্যে কেরামের সাথে যত গায়েবী মদদ, বরকত, নুসরাত এবং বাহ্যিক ধারণার পরিপন্থি যত মদদ ও সাহায্য সংঘটিত হয়েছে সেগুলি বেশি বেশি বয়ান করতে হবে এবং এই বয়ান করার সময় নিজের মধ্যে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব কিংবা সন্দেহ সংশয় না থাকতে হবে যে, এরকম হওয়া আদৌ সম্ভব কিনা!!

আসবাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আল্লাহর প্রতি আশাবাদী হওয়া কুফরীর রাস্তা

আজ আমরা যখন পরস্পরে কথা বলি তখন বলি ভাই তুমি আসবাবের ব্যাপারে চেষ্টা করতে থাক আর আল্লাহর নিকট আশা রাখ। বন্ধুরা আমার! এটা একেবারেই নাকামী রাস্তা, আমি আপনাদের কি ভাবে বুঝাব ভাই। আমরা আল্লাহর জন্য করলাম কি যে, তার নিকট আশা করব। মেহনত করছি বস্তুর উপর আর আশা রাখছি আল্লাহর উপর। এই জন্যই হযরত জী মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) বলতেন, বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রেখে আল্লাহর নিকট আশা করা কুফরের রাস্তা, কেননা অমুসলিমরাও তো আল্লাহর নিকট আশা রাখে। তারাও বলে জাহেরী আসবাব অবলম্বন করা আমাদের যিম্মায় আর করনেওয়ালা যাত তো আল্লাহ। এতটুকু আশা তো তারাও আল্লাহর নিকট রাখে। মুসলমানরাও যখন এই একই কথা বলেছে তখন এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটা থাকল কোথায়?

আমাদের এক সাথির কোন সন্তান হচ্ছিল না। সে একজন অমুসলিম ডাক্তারের চিকিৎসা নিল। ডাক্তার সবকিছু চেকআপ করে বলল কোন অসুবিধা নেই। আমি সব কিছু দেখে দিলাম এখন দেবী শুধু উপর ওয়ালার হুকুমের। কিসের দেবী ভাই? উপর ওয়ালার ফায়সালার। সে যখন এসে আমাকে বলল যে, অমুসলিম ডাক্তার এই কথা বলেছে যে, আমি তো আমার কাজ পুরা করে দিলাম এখন উপর ওয়ালার হুকুমের অপেক্ষা! তখন আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম যে, আমাদের মধ্যে আর তার মধ্যে পার্থক্য কোথায়! সে যে কথা বলেছে আমরাও তো সেই একই কথা বলি যে, আসবাব আমরা অবলম্বন করছি এখন করার মালিক তো আল্লাহ। তাহলে আমাদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়?

মুহতারাম দোস্ত-বুয়ুর্গ! দেখুন আমাদের আর তাদের মধ্যে পার্থক্য হল, যারা আল্লাহকে করনেওয়ালা যাত মনে করেনা তাদের মধ্যে আর আল্লাহর মধ্যে আসবাবের মধ্যস্ততা থাকে। আর যারা আল্লাহকে করনেওয়ালা যাত মনে করে তাদের মধ্যে আর আল্লাহর মধ্যে আহকামাতের মধ্যস্ততা থাকে যে, হে আল্লাহ! আমি নামায পড়েছি, হে আল্লাহ আমি সদকা করেছি, হে আল্লাহ! আমি সত্য বলেছি। এখন করনেওয়ালা তুমিই। আমার এই এই কাজ তুমি করে দাও। অর্থাৎ

মুমিন আল্লাহর হুকুম পূরা করে আশা করবে আর কাফের আসবাব অবলম্বন করে আশা করবে। খুব ভাল করে বুঝে নিই ভাই। উভয়ে কিন্তু আল্লাহর নিকটই আশা করেছে। কিন্তু পার্থক্য রয়ে গেছে আহকাম আর আসবাব এর মধ্যে।

একবার রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক মুশরিককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, দুনিয়াতে তোমরা যখন কোন ক্ষতির সম্মুখীন হও তখন তা পূরণের জন্য কি কর? উত্তরে মুশরিক বলল, উপরে যে আল্লাহ আছেন তাকে আমি বলি, তিনি আমার ক্ষতি দূর করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যেই আল্লাহ তোমার কাজ পূরা করে দেন, তোমার থেকে ক্ষতি দূর করে দেন, তারপরেও তুমি তার সাথে শরীক কর কেন?

তো খুব ভালভাবে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের আর আল্লাহর মধ্যে মাধ্যম কায়েনাত না বরং মাধ্যম হল আহকাম। এখন প্রশ্ন হবে তাহলে আল্লাহ তা'আলা আসবাব বানিয়েছেন কেন? উত্তর সহজ। আমাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা এগুলি বানিয়েছেন। তিনি দেখতে চান আমরা কি আসবাবকে হাজত পুরাকারী মনে করি নাকি খালেকে আসবাব তথা সৃষ্টি কর্তাকে হাজত পূরণকারী মনে করি। ব্যস এটাই উদ্দেশ্য। চাই সেটা ছোট একটা দোকান হোক কিংবা হযরত সুলাইমান (আ.) এর বিশাল রাজত্ব হোক। কত বড় ছিল সুলাইমান (আ.) এর রাজত্ব? সুবহানাল্লাহ! এমন বাদশাহী যে সারা মাখলুক তার অনুগত। যার নিকট থেকে যে কাজ নিতে ইচ্ছা করতেন নিতেন। কিন্তু এটাও শুধু পরীক্ষার জন্য। আসবাব চাই নবীর কাছে হোক বা উম্মতের কাছে হোক। সব পরীক্ষার জন্য। আসবাবের মধ্যে সকলের জন্য দুটি পরীক্ষা রয়েছে।

একটা হল আনুগত্য আরেকটা হল ধারণা। তোমাকে যে আসবাব আমি দিয়েছি সেটা পেয়ে আমাকে তুমি ভুলে যাওনি তো? একবার হযরত সুলাইমান (আ:) তার অশ্বসমূহ পরিদর্শন করছিলেন, সেরকম ঘোড়া বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও নেই। এমন ঘোড়া যা দৌড়াত, উড়ত আবার সাতারও কাটত। এমনিই দামী ঘোড়া, এসব ঘোড়া পরিদর্শন করতে করতে আসরের নামায কাযা হয়ে সূর্য ডুবে গেল। আসবাব দেখায় এমনই মশগুল হয়ে গেলেন যে, আসরের নামায কাযা হয়ে

গেল। কিন্তু কথা হল কি, আমল ছুটে গেলে যারা পেরেশান হয়ে যায়, ব্যথিত হয়ে যায় আল্লাহ পাক তাদের আমলকে বিনষ্ট করেন না। এই জন্যই বলা হয়েছে সমস্ত নেকীর ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া। তো হযরত সুলাইমান (আ.) এমন ব্যথিত আর পেরেশান হলেন যে, আল্লাহ পাক সূর্যকে আবার ফিরিয়ে দিলেন। দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর আবার আলোকিত করে দিলেন। এটা হল একটা পরীক্ষা যে, আসবাবের মধ্যে মশগুল হয়ে তোমরা আনুগত্যকে ভুলে যাও কি না?

দ্বিতীয় পরীক্ষা হল, কোন কিছু হওয়াকে তোমরা এই আসবাবের দিকে সম্পৃক্ত কর না কি আমি আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত কর।

আসবাবের সাথে আল্লাহর কোন ওয়াদা নেই

কোন কাজের এরাদা করার পরে বান্দাহ যদি আল্লাহকে ভুলে যায় তাহলে আল্লাহ পাক তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য সেই কাজে তাকে ব্যর্থ করে দেন। আর যদি এই অবস্থায় আল্লাহকে কেউ স্মরণ করে বসে তাহলে আল্লাহ পাক তার জন্য রাস্তা খুলে দেন। আর আল্লাহর কথা স্মরণ না হলে তার জন্য বেবরকতী আর পেরেশানীর রাস্তা খুলে যায়। তো এই হল আসবাবের কার্যকারিতা আর দর্জা। এই জন্যই আখিয়ায়ে কেরাম আর সাহাবায়ে কেরামের সাথে ঘটে যাওয়া গায়েবী মদদের কথা বেশি বেশি আলোচনা করতে হবে।

সাহাবায়ে কেরামের মদদ লাভ করার এসব ঘটনা বেশি বেশি আলোচনা করা এটা হচ্ছে ঈমান মজবুত হওয়ার তৃতীয় সবব বা মাধ্যম। এই জন্যই হযরতজী মাওলানা ইউসুফ (রহ.) হায়াতুস সাহাবার মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করার পরে সর্বশেষ সাহাবায়ে কেরামের সাথে গায়েবী মদদের ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছেন। যার থেকে অনুমান করা যায় যে, কেমন ধরনের আমলের কারণে সাহাবায়ে কেরাম এসব মদদ আর সাহায্য লাভ করেছিলেন। সুতরাং এটা একেবারে দ্ব্যর্থহীন কথা যে, আসবাবের উপর আল্লাহর কোন ওয়াদা নেই। আল্লাহর কুদরত নিহীত আছে তার ওয়াদার সাথে। আর ওয়াদা জড়িত আছে তার হুকুমের সাথে। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম মানা হবে তো আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওয়াদা অনুযায়ী বান্দাকে সাহায্য করবেন। আর সেই সাহায্যের মধ্যে তার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। মানুষের উপর

বড়ই আশ্চর্য্য হতে হয় যে, তারা আল্লাহর সামনে আসবাব রেখে দু'আ করে। বন্ধুরা আমার! আল্লাহর সামনে আমল রেখে তার পরে দু'আ করি। যেমন হে আল্লাহ এই সদকা আমি দিলাম যার উপর তোমার ওয়াদা রয়েছে। হে আল্লাহ! আমি এই নামায পড়লাম যার উপর তোমার ওয়াদা রয়েছে। হে আল্লাহ! আমি এই সত্য বললাম যার উপর আপনার এই ওয়াদা।

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আমরা অনেকেই জানি। একবার বনী ইসরাঈলের তিন ব্যক্তি একটি গুহায় আটকা পড়েছিল আর উপর থেকে একটি পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ তাদের সামনে ছিল না, তখন তারা প্রত্যেকে আল্লাহ পাকের নিকট স্ব স্ব নেক আমলের কথা উল্লেখ করে দু'আ করল। কেউ কিন্তু কোন আসবাব পেশ করে নাই বরং আমল পেশ করেছিল।

একজন মুআশারার আমল পেশ করল।

একজন মুআমালার আমল পেশ করল।

একজন আখলাকের আমল পেশ করল।

কেউ এই দু'আ করে নাই যে, হে আল্লাহ একটা ক্রেন পাঠিয়ে দাও যা এই পাথরটিকে সরিয়ে দেয় কিংবা এমন তুফান যা পাথরটিকে হটিয়ে দেয়। অথবা কোন ভূমিকম্প যাতে পাথরটা এখান থেকে সরে যায়। বরং তারা তিনজনেই আল্লাহ পাকের সামনে নিজ নিজ আমল পেশ করল। একজন বলল, হে আল্লাহ! আমি আমার পিতা-মাতার আগে আমার বাচ্চাদেরকে কখনো খেতে দিতাম না। দুধ পান করাতাম না, মাঠ থেকে এসে বকরী দোহন করে সবার আগে মা-বাবাকে পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে দেরী হয়ে গেল ফলে আব্বা আম্মা ঘুমিয়ে পড়লেন, আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে সারা রাত পিতা মাতার শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অন্য দিকে আমার বাচ্চারা ক্ষুধায় ছটফট করছে কিন্তু পিতা-মাতার আগে তাদেরকে দেয়াটা আমি পসন্দ করলাম না। আবার পিতা-মাতাকেও ঘুম থেকে জাগ্রত করা মুনাসিব মনে করলাম না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মাফ করুন এখন তো পিতা-মাতার সাথে আমাদের আচরণ এমন যেমনটা করা হয় পণ্ডর বাচ্চার সাথে। পণ্ডর বাচ্চা বড় হয়ে যেমন তার মা-বাপকে চেনে না আমরাও বড় হয়ে

মা-বাপকে চিনি না। অথচ মানুষকে অসিয়াত করা হয়েছে যে, যে মা তোমাকে জনের প্রাক্কালে পেটে ধারণ করে কষ্টের পর কষ্ট বরদাশত করেছে, তোমাকে দুধ পান করানোর সময় কষ্ট বরদাশত করেছে সেই পিতা-মাতা যেন তোমার জন্য বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। মুসলমানদের বেবরকতির সবচেয়ে বড় কারণ হল, আজ তাদের পিতা-মাতার খেদমত না করা। বরকতের জন্য লোকেরা দু'আ চায়, তাবীজ নেয় অথচ পিতা-মাতার খেদমতের চেয়ে বড় দু'আ আর কি হতে পারে? সমস্ত আমল এক দিকে আর পিতা-মাতার খেদমত আরেক দিকে। কারণ হল সন্তান পিতা-মাতার নিকট ঋণী। গর্ভ ধারণের ঋণ, দুধের ঋণ যা কোন দিনই শোধ করতে পারে না। অথচ সেই সন্তানের ব্যবহার স্বীয় পিতা-মাতার সাথে আজ জানোয়ারের মত।

তো যে কথা বলছিলাম, সে দু'আর মধ্যে নিজেদের আমল পেশ করার পরে পাথর সরে গেল। কিন্তু বের হওয়ার মত রাস্তা হল না কেননা, তুমি আমল করলে তোমার নাজাত আর সে আমল করলে তার নাজাত এমন না। বিষয়টি এখানে ইজতিমাদি। আর দ্বীনও ইজতিমাদি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি যে আমল পেশ করল সেটা ছিল মুআমালার মধ্যে এহসান করার। সে বলল, আমি একজন শ্রমিককে কাজে নিয়েছিলাম কিন্তু সে পারিশ্রমিক না নিয়েই চলে গিয়েছিল। তার সেই পারিশ্রমিক বিনিয়োগ করে আমি তার ফল অনেকগুণে বৃদ্ধি করলাম। দীর্ঘ দিন পর সে যখন তার পারিশ্রমিক নেয়ার জন্য আসল তখন সারা উপত্যকা ভেড়া-বকরী দ্বারা ভরপুর ছিল। আমি তাকে বললাম এসবই তোমার। তুমি এগুলি নিয়ে যাও। কেননা, তার পারিশ্রমিক দিয়েই মূল পূজি ক্রয় করা হয়েছিল অতঃপর সেগুলি বৃদ্ধি পেয়ে এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল। সে বলল, আল্লাহর বান্দা! আমার সাথে ময়াক না করে আমার পারিশ্রমিকটা আমাকে দিয়ে দাও। আমি বললাম ময়াক নয় এটাই বাস্তব। এসবই তোমার মাল। তুমি নির্দিধায় সব নিয়ে যাও। তো এখানে বিষয়টি ছিল মুআমালার মধ্যে এহসান করার। এই আমল পেশ করে সে বলল, একাজটা আমি যদি তোমার জন্য করে থাকি তাহলে আমাদেরকে এখান থেকে উদ্ধার কর। এবার পাথর আরেকটু সরে গেল। কিন্তু বের হওয়ার মত রাস্তা হল না। কেননা দ্বীন তো হল মাজমুআ, উম্মতও মাজমুআ।

মুআমালাতের কারণে যে হালত আসবে তা ইবাদত দ্বারা ঠিক হবে না

আমি আপনাদেরকে কিভাবে বুঝাবো বলুন। লোকেরা লম্বা লম্বা নামায পড়ে। হজের পর হজ্ব করে। যিকিরের পর যিকির করে কিন্তু মুআমালাত, মুআশারাত এবং আখলাক এই তিন লাইনেই ফেল। হযরত (রহ.) বলতেন, মুআমালাতের কারণে যে হালত পয়দা হয় তা ইবাদতের দ্বারা ঠিক হবে না। যদি কেউ চায় যে, আমাদের ইবাদত দ্বারা অস্বচ্ছলতা দূর হয়ে যাক তাহলে এটা কতদিনকালেও হবে না। মুআমালাতের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন আমাদের সমাজে আজ এগুলির কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। কেননা তাদের দৃষ্টি নিজেদের ইবাদতের উপর থাকে, তাদের মনে অহংকার এই পরিমাণ বাসা বাঁধে যে, তারা মুআমালাতের কোন পরোয়া করে না। অথচ মুআমালা নষ্ট করে যারা ইবাদত করছে খোদার কসম, এই ইবাদত তারা অন্যের জন্য করছে। কেননা এইসব ইবাদত অন্যদের হক নষ্ট করার কারণে তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। এক সময় সব সাওয়াব শেষ হয়ে গেলে হকদারদের গোনাহ তাদের উপর চাপিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। বলা হবে এই সেই আবেদ যে মুআমালার কোন পরোয়া না করে শুধু ইবাদতে মগ্ন ছিল।

বড়ই চিন্তার বিষয় মুহতারাম দোস্ত বুয়ুর্গ! এমন যেন না হয় যে, আমাদের ইবাদতের উপর অন্যের কজা হয়ে যায়। আমাদের মুআমালার উপর যেন ইবাদাতের পর্দা পড়ে না যায়। তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সেই পর্দা সরিয়ে ইবাদাত দ্বারা মুআমালার ত্রুটি পুরা করবেন। কেননা আখেরাতের কারেন্সী হচ্ছে আমল। এই জন্য নিজেদের আমলের হেফাজত করতে হবে। নতুবা হকদাররা সব আমল এমনভাবে নিয়ে যাবে যে, মকবুল নামায, মকবুল হজ্ব, মকবুল যিকির, মকবুল রোযা সব খতম হয়ে যাবে।

ক্ষুধা-দারিদ্রতা মানুষকে কুফুর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়

তৃতীয় ব্যক্তি তার আমল এই বলে পেশ করল যে, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাত বোন ছিল যাকে আমি ভালবাসতাম, তাকে আমি একান্তে কামনা করতাম কিন্তু সে তাতে সম্মত হত না। একবার

দুর্ভিক্ষের কারণে তার অস্বচ্ছলতা দেখা দিল। সে মুখাপেক্ষী হয়ে আমার স্বরূপ হল। আমি তাকে বললাম তুমি যদি আমাকে একান্তে মিলিত হওয়ার সুযোগ দাও তাহলে তোমাকে আমি ১২০ টি স্বর্ণমুদ্রা দিতে রাজি আছি। সে এতে রাজি হয়ে গেল। কেননা ক্ষুধা মানুষকে কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যায়। সেও ক্ষুধার কারণে ব্যভিচারে রাজি হয়ে গেল। অতঃপর সুযোগ পেয়ে যখন আমি তার দুই হাটুর মাঝখানে বসলাম তখন সে আমাকে বলল, আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহকে ভয় কর। আমি তাৎক্ষণিক তার থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। হে আল্লাহ! শুধুমাত্র তোমার ভয়ে সুযোগ পেয়েও আমি এই কাজ থেকে বিরত থাকলাম আর সেই ১২০ দীনার তাকে দিয়ে দিলাম। সুতরাং হে আল্লাহ! তুমি আমাদের বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।

মুহতারাম দোস্ত-বুয়ুগ! এই ঘটনা বয়ান করা হয়েছে আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভ করার মূলনীতি বর্ণনা করার জন্য। এসব ঘটনা শুনে লোকেরা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলে ওঠে। কিন্তু জীবন যেখানে ছিল সেখানেই থেমে থাকে।

হযরত (রহ.) বলেন, পূর্ববর্তীদের যত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তার দ্বারা পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য না বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে তাদের জন্য আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভের মূলনীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তারা এরকম ছিল, তারা ওরকম ছিল এটা বলা উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হল, তোমরা যদি এরকম কর তাহলে তোমাদের সাথেও এই আচরণ করা হবে এটা বলা উদ্দেশ্য। বরং তাদের সাথে যতটুকু হয়েছে একজন মুমিনের সাথে তার চেয়ে দশগুণ বেশি হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একজন মুমিনকে দশ জন সাহাবীর সমপরিমাণ বিনিময় প্রদান করা হবে।

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং সম্পূর্ণ সহীহ হাদীস। মুত্তাখাব হাদীসে হযরত (রহ.) এটাকে নকল করেছেন। এসব হাদীসের উপর চিন্তা ফিকির করুন। তাহলে ঈমান মজবুত করার তৃতীয় মাধ্যম হল সাহাবায়ে কেরামের সাথে যে গায়েবী মদদ হয়েছে সেগুলির আলোচনা খুব বেশি বেশি করা।

ঈমান মজবুত হওয়ার চতুর্থ মাধ্যম

ঈমান মজবুত করার চতুর্থ বিষয়টি হল ঈমানের আলামত গুলিকে খুব বেশি আলোচনা করতে হবে। যাতে করে আমাদের ঈমানের দুর্বলতাগুলি আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আমরা কত গাফেল। একটি হাদীসের মধ্যে ঈমানের আলামত এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমার ভাল কাজ তোমাকে খুশি করে আর খারাপ কাজ তোমাকে বিষন্ন করে তখন মনে করবে যে তুমি মুমিন। কত স্পষ্ট কথা যে, আল্লাহর হুকুম পূরা করতে পেরে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠছে আবার গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে মনের মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করছে। ছোট একটা সুনত ছুটে যাওয়ার কারণে পেরেশান হয়ে পড়ছে এটাই হল ঈমানদার হওয়ার আলামত। এবং এটাই হচ্ছে তাওবা। গোনাহ করার পরেও যদি পেরেশানী না আসে তাহলে তার তাওবাও নসীব হবে না। এটা হচ্ছে ঈমান মজবুত হওয়ার একটা সবব বা কারণ।

ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলামত হল তাকওয়া

ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলামত হচ্ছে তাকওয়া। কুরআনে পাকে কালেমা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ কে তাকওয়ার কালেমা বলা হয়েছে। আর মুমিনকে তার হকদার বলা হয়েছে।

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ

وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى

এই আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে, আল্লাহ ঈমানদারদেরকে তাকওয়ার কালেমার উপর জমিয়ে দিয়েছেন।

এই জন্য দোস্ত বুয়ুর্গ! সর্ব প্রথম আমাদের জীবনে তাকওয়া আনতে হবে। তাকওয়া বলা হয় হারাম থেকে বেঁচে থাকাকে। আর এই তাকওয়া সবার আগে আনতে হবে মুআমালা তথা লেন-দেনের মধ্যে। মুআমালার মধ্যে সর্ব প্রথম তাকওয়া এই জন্য আনতে হবে যে, ওয়ূ ছাড়া যেমন নামায হয় না তদ্রূপ মুআমালা ছহীহ হওয়া ছাড়া ইবাদত কবুল হবে না। প্রথমে পবিত্রতা অতঃপর ইবাদত। প্রথমে ওয়ূ পরে নামায। ঠিক এভাবেই প্রথমে মুআমালাত পরে ইবাদাত। এ ব্যাপারে

খুব চিন্তা ফিকির করতে হবে যে, শরীরের প্রবাহমান রক্ত যদি সুদ, ঘুষ, মিথ্যা, চুরি, খেয়ানত, ভেজাল ইত্যাদি থেকে পাক না হয় তাহলে সে তো নিজের শরীরকে ইবাদাতের জন্য তৈরিই করে নাই। শরীরে হারাম রক্ত দৌড়াচ্ছে আর সে করছে ইবাদাত বন্দেগী।

এই দুই জিনিষ তো একসাথে জমা হতে পারে না।

মুআমালাতের গোনাহ ইবাদাত দ্বারা মাফ হবে না

লোকেরা মনে করে মুআমালাতের গোনাহ ইবাদাত দ্বারা মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু এটা কখনো সম্ভব নয়। মুআমালাতের গোনাহ ইবাদাতের দ্বারা কিভাবে মাফ হবে বলুন! ইবাদাতের প্রথম শর্ত পবিত্রতা সেটাই তো পূরা করে নাই। অথচ পবিত্রতা ছাড়া কোন ইবাদাত গ্রহণযোগ্য নয়। ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য জায়গা পাক, শরীর পাক, কাপড় পাক ইত্যাদি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তদ্রূপ শরীরের রক্ত মাংস পাক রাখাও জরুরী। অমুসলিমরা খুব ভালভাবে জানে যে, মুসলমানদের মধ্যে হারাম ঢুকিয়ে দিতে পারলে তাদের বদদুআ থেকে বেঁচে থাকা যাবে, তাই তারা মুসলিম সমাজে সুদ, ঘুষ ইত্যাদির প্রসার ঘটিয়ে এই সুযোগ টা গ্রহণ করেছে। কেননা হারামখোরের দুআর উত্তরে আল্লাহ তাআলা এটাই বলে থাকেন :- **أَنَّى لَكَ الْإِجَابَةَ** - তোমার দুআ আমি কিভাবে কবুল করব? তোমার খানা হারাম, পানীয় হারাম, লেবাস হারাম। অথচ সে এদিকে খুব কাকুতি-মিনতি করে দুআ করছে ইয়া রব! ইয়া রব! তো তার এই দুআ কিভাবে কবুল হবে?

এই জন্যই দোস্ত-বুয়ুর্গ! সর্ব প্রথম আমাদের মুসলমানদের মধ্যে দ্বীন আনতে হবে। আর দ্বীনের মধ্যেও সর্ব প্রথম তাকওয়া আনতে হবে। কেননা সমস্ত নেকীর মূল হচ্ছে তাকওয়া। তাকওয়ার উপরেই আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে। যে হারাম থেকে বাঁচতে চাইবে আমি তাকে বাঁচিয়ে দেব। এটা আল্লাহর ওয়াদা।

হযরত ইউসুফ (আ.) হারাম থেকে বাঁচার জন্য দৌড় দিলেন আর তার জন্য বন্ধ দরজাগুলি একে একে খুলতে লাগল। কেউ হারাম থেকে বাঁচতে চায় আর আল্লাহ তার জন্য রাস্তা বের করে দেবেন না এটা হতে পারে না। তবে একটা কথা আছে এখানে, সেটা হল যে ব্যক্তি তাকওয়ার লাইন ধরবে আল্লাহ পাক তাকে অবশ্যই পরীক্ষা করবেন যে, এ ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় মুসলিম কিনা। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)

তাকওয়ার কারণে বন্ধ কুঠরী থেকে বের তো হয়ে আসলেন কিন্তু তার স্থান হল জেলে। এর কারণ হল, মানুষ যখন গোনাহ থেকে বাঁচতে চায় তখন আল্লাহ পাক দেখতে চান সে আবার গোনাহের দিকে প্রত্যাভর্তন করে কিনা।

আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে এমন অনেক লোকের দেখা পাবেন পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন, অনেক ঋণ হয়ে গেছে, ব্যবসায় লঙ্ঘ হয়েছে, মামলা মুকাদ্দমা হয়ে গেছে ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করেন, হেফাজত করেন। অনেক লোক এই পরিস্থিতিতে এসে আবার হারামের দিকে ফিরে গেছে। অথচ আল্লাহ তাআলা তো জানিয়েই দিয়েছেন যে, আমি তোমাদেরকে সামান্য একটু পরীক্ষা করব। **وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ**

অল্প একটু ক্ষুধা

অল্প একটু ক্ষতি

অল্প একটু ভয়

যদি এর উপর জমে থাকতে পার তাহলে এর পরে তোমার জন্য রাস্তা খুলে দেবেন। এটা তো শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য কিন্তু অনেকেই বুঝতে না পেরে আবার হারামের দিকে ফিরে যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা তো সত্যবাদীদের থেকে তাদের সত্যতার পরীক্ষার নেবেনই। হযরত কাআব ইবনে মালেক (রাহ.) এজন জালীলুল কদর সাহাবী। তারুকের যুদ্ধের সময় তিনি মদীনায় রয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জেহাদ থেকে ফিরে আসার পরে তিনি নবীজীর খেদমতে হাজির হয়ে সত্য কথা বললেন যে, আমার সবকিছু ছিল কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে আমার আর যাওয়া হয়নি। এটা আমার দ্বারা ভুল হয়ে গেছে। একেবারে সত্য কথা তিনি বলে দিলেন। কিন্তু আল্লাহর রাসুল নারাজ হয়ে গেলেন। কেননা কাআব ইবনে মালেক সত্য কথাই বলেছিলেন। নবীজীর খেদমত থেকে বাইরে আসার পর লোকেরা তাকে বলল, কাআব! এটা তুমি কি করলে? তুমি যদি মিথ্যা কোন ওজর পেশ করতে তাহলে জানও বাঁচত আর আল্লাহর রাসুল তোমার জন্য ইস্তিগফারও করতেন। সেই ইস্তিগফারের কারণে তোমার মিথ্যা বলার গোনাহও মাফ হয়ে যেত। লোকেরা এই পরামর্শ দিলে তিনি একবার চিন্তা করলেন যে, আবার নবীজীর খেদমতে যেয়ে আমার বক্তব্য ফিরিয়ে নিই। কিন্তু আমি চিন্তা করলাম নবীর উপরে তো আল্লাহ

পাকের যাত বিদ্যমান তিনি তো সবকিছু জানেন দেবেন। আমি এখন মিথ্যা বলে আব্বাহর রাসুলকে যদি রাজি করিয়েও নিই কিন্তু আব্বাহ পাক তো তা প্রকাশ করে দেবেন। মিথ্যা বলে আমি আজ সামান্য সুবিধা লাভ করলে আব্বাহ পাক তার হাবীবকে সঠিক ঘটনা জানিয়ে দেবেন। সুতরাং সবর করাই আমার জন্য ভাল। যাই হোক বন্ধুরা! আমি বলছিলাম যে, যখন কোন মানুষ হারাম ছেড়ে আব্বাহর হুকুমের নিকে আসে তখন আব্বাহ তাআলা তাকে পরীক্ষা করে দেবেন যে এই অবস্থায়ও আমার হুকুমের উপর বসে কিনা।

মোহতারাম দোস্ত-বুয়ুর্গ হযরত ইউসুফ (রাঃ) তাকওয়া অবলম্বন করতে যেয়ে সেখান থেকে পলায়ন করলেন কিন্তু তাকে জেলে যেতে হল। অবশ্য জেলে যেয়েও তিনি দুটি কাজ করতে থাকলেন। যারা জেলে আসত তাদেরকে দাওয়াত দিতেন আর ইবাদত বন্দেগী করতে থাকতেন। এমনটি মনে করেননি যে, জেলের মধ্যে আবার কিভাবে দাওয়াত দেব। আমার অবস্থা তো এখন দাওয়াত দেয়ার মত নয়। না ভাই দাওয়াতের কাজ সব জায়গায় করতে থাকতে হবে।

দাঈ কখনো অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হবে না

এমন অনেক লোকের সাথে আপনাদের মূল্যাকাত হবে যারা বলে থাকে আমাদের অবস্থা এখনও অনুকূল নয়, কাজের পরিবেশ নাই এখন। বছরের চিন্তা নাই, মাসের তিন দিন নাই, সপ্তাহের গাশত নাই, বলে একটা মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম, মিথ্যা মুকাদ্দামা চালানো হয়েছিল, এগুলি ঠিক হয়ে গেলে আবার কাজ করব ইনশাআল্লাহ। হযরত জী মাওলানা ইউসুফ (রহ.) বলতেন, যারা বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করবে না তারা এই কাজ ছেড়ে আরো ভয়ানক পরিস্থিতিতে কেমন যেন দাওয়াত দিল। এবার তাদেরকে আরো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, সেটা তারা বরদাশত করতে পারবে না। কেননা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যে দাওয়াত দেবে না সে আরো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। হযরত ইউসুফ (রহ.) জেল খানায়ও দাওয়াত জারি রেখেছিলেন, আব্বাহ পাক দাওয়াতের বরকতেই তাকে জেল থেকে বের করলেন।

মোহতারাম দোস্ত! খুব ভালভাবে মনে রাখতে হবে যে, আব্বাহ তাআলা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের পরীক্ষা করবেন। যদি তাকওয়ার

উপর জায়ে থাকতে পারে তাহলে আল্লাহ তাআলা সর্বদার জন্য বরকতের দরজা খুলে দেবেন। আরেকটা জরুরী কথা যা আমি আরজ করতে চাই তা হল হযরত ইউসুফ (রহ.) ছবর আর তাকওয়া উভয়টিকে সমান সমান অবলম্বন করেছিলেন আর আমাদের সমস্যা হল আমরা ছবর তো করতে পারি কিন্তু তাকওয়া অবলম্বন করতে পারি না। কুরআন পাকে ছবর আর তাকওয়ার কথা এক সাথেই আলোচনা করা হয়েছে, কোথাও আশে ছবরের কথা আর কোথাও আশে তাকওয়ার কথা। আর মুসলমানদের অবস্থা হল আজ তারা ছবর করছে তাকওয়া ছাড়া। আজ মুসলমান যত মার খাচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে, বোমাবাজি হচ্ছে, ড্রোন হামলা হচ্ছে তারা অপেক্ষা করছে আল্লাহ পাকের সাহায্যের, মনে করছে এই তো আল্লাহর সাহায্য আসল বলে। কিন্তু গোনাহ থেকে বাঁচার কোন ইচ্ছা নেই। বেপর্দার সয়লাব, সুদ ঘুষের সয়লাব, তাকওয়া কোথাও নেই। সকলেই বলছে ছবর কর। এই রক্ত বৃথা যাবে না। আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে। কিন্তু খুব ভাল করে মনে রাখবেন মুসলমান যখন আল্লাহর হুকুম লংঘন করে ছবর করে আল্লাহ পাক তখন তাদের উপর বাতিলকে চাপিয়ে দেন। পক্ষান্তরে মুসলমান যদি আল্লাহর হুকুমকে আকড়ে ধরে তাহলে বাতিলের উপর বিজয়ী করেন।

আখিয়ায়ে কেরাম এবং সাহাবায়ে কেরামের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা সমূহের খুলাসা এটাই। সুতরাং গোনাহর কারণে যে হালতের সৃষ্টি হয় তা ছবরের দ্বারা ঠিক হবে না, আজ মুসলমান ছবর তো করছে কিন্তু তাকওয়া ছাড়া। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন-

اضْبِرُوا أَوْ لَا تَضْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَلَمْ يَأْتِجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা ছবর কর কিংবা নাই কর উভয়টি সমান, কেননা ছবর দ্বারা তোমাদের কোন ফায়দা হবে না, তোমাদেরকে এই যে আযাব দেয়া হচ্ছে তা তোমাদের গোনাহের কারণে।

মুসলমান আজ যত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে তা শুধুমাত্র ছবর দ্বারা শেষ হবে না। কেননা যে কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেটি হল মুসলমানদের অমুসলিমদের কৃষ্টি-কালচার গ্রহণ করার দরুন। মুসলমানরা যদি এই तरीকা পরিত্যাগ করে তাহলে তারা দুটি জিনিষ লাভ করবে। প্রথম হল নিরাপত্তা আর দ্বিতীয় হল হেদায়াত। এটা

কুরআনের কথা। হেদায়াতের অর্থ হল জান্নাতের পথে পরিচালিত হওয়া, আর নিরাপত্তার অর্থ হল শান্তি ও স্বস্তির জীবন।

এই ওয়াদা তাদের জন্য যারা অমুসলিমদের তরীকা থেকে পরিপূর্ণভাবে সরে আসবে। আমি যা কিছু বললাম তা কুরআনেরই কথা :-

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

যারা নিজেদের ঈমানের সাথে গায়েরের তরীকাকে মিশ্রিত করবে না তারা হেদায়াত এবং নিরাপত্তা লাভ করবে।

এই জন্য মনে রাখতে হবে যে, তাকওয়া ছাড়া মুসলমান অমুসলিম থেকে নিজস্ব স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পারবে না। কেননা মুসলমানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাকওয়ার দ্বারাই পরিস্ফুটিত হবে-

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

যদি তোমাদের মধ্যে তাকওয়া থাকে তাহলে তোমরা অন্যদের থেকে স্বাভাবিকতা লাভ করবে আর তাকওয়া না থাকলে তাদের মধ্যে আর তোমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।

ইসলাম শুধু পতাকার নাম নয়

ইসলাম শুধু ইসলামী পতাকা কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের নাম নয়, বরং ইসলাম তো পরিপূর্ণ একটা জীবন বিধান। সেই তরীকা মত যে চলবে সে হবে মুসলমান। ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি। ইসলামের ভিত্তি যদি পাঁচটি জিনিস হয় তাহলে ইসলাম কি জিনিস? যেমন বিল্ডিং এর ভিত্তি হয়, মসজিদের ভিত্তি হয় যা মাটির নিচে থাকে, তার উপর বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়। অনুরূপভাবে ইসলামের বুনিয়াদ বা ভিত্তি যদি পাঁচটি জিনিস হয়ে থাকে তাহলে ইসলাম কিসের নাম? হাঁ ভাই মুআমলাত, আখলাক, মুআশারাত এই তিনটি হল ইসলামের ইমারত বা বিল্ডিং আর ঈমানের বুনিয়াদ হল সাতটি জিনিস যথা-আল্লাহর উপর ঈমান রাখা, তার ফেরেশতাদের উপর, কিতাব সমূহের উপর, ভাল-মন্দ তকদীরের উপর, আখেরাতের দিনের উপর-এগুলি হচ্ছে ঈমানের বুনিয়াদ, এগুলিকে বলা হয় আকীদা বিশ্বাস। আকীদা ছাড়া বিল্ডিং নির্মাণ করা যাবে না, আর বিল্ডিং ছাড়া শুধু বুনিয়াদও যথেষ্ট নয়। উভয়টির প্রয়োজন, অনুরূপভাবে ইসলামের বুনিয়াদও পাঁচটি-কালেমার স্বীকৃতি দেয়া, নামায, রোযা, হজ্জ,

মসজিদ আবাদের মেহনত
যাকাত আদায় করা, আর মুআমালাত, মুআশারাত আখলাক হচ্ছে
ইসলামের ইমারত বা বিল্ডিং। শুধু বুনিয়াদ বা ভিত্তিই যথেষ্ট নয়
প্রয়োজন পুরা করার জন্য। আবার ভিত্তি ছাড়া বিল্ডিং বানানোও উপকারী
না, বানালেও তা স্থায়ী হবে না।

সুন্নত ছাড়া কেউ ওলী হতে পারে না

মোহতারাম দোস্ত-বুয়ুর্গ! প্রতিটি কাজের মধ্যে সুন্নতের এহতেমাম
করাও জরুরী। কেননা সুন্নত ছাড়া কেউ বুয়ুর্গ আর ওলী হতে পারে না।
হযরত জী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলতেন, আমার এই কাজের
উদ্দেশ্য হল, সুন্নতের প্রচার-প্রসার, যাতে করে মুসলমানদের জীবনে
রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নত অনুযায়ী আমল
করার অভ্যাস পয়দা হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তাআলার মদদ ও
বরকত সুন্নতের সাথে আর মুসলমানের শান সুন্নতের সাথেই পরিস্ফুটিত
হবে। মুসলমান যদি সুন্নতকে হালকা মনে করে ছেড়ে দিতে থাকে
তাহলে সর্ব প্রথম তারা মুআশারাতি ইরতিদাদের মধ্যে পড়ে যাবে।
অর্থাৎ সর্ব প্রথম তাদের মুআশারাত অর্থাৎ সামাজিকতা, সামাজিক
আচার আচরণ ইসলাম গুণ্য হয়ে যাবে।

মুসলমানের স্বাভাবিকতা সুন্নতের ইহতেরামের মধ্যে নিহীত, নতুবা
দেখুন কোথাও দাংগা ফ্যাসাদ হলে, দুর্ঘটনা ঘটলে মুসলমানের পরিচয়
লাভ করার জন্য অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। হযরত জী
মাওলানা ইউসুফ (রহ.) বলতেন, যেসব কারণে দূর থেকে মুসলমানদের
কে দেখে আল্লাহর কথা মনে পড়ত সেসব কারণ আজ মুসলমানদের
মধ্যে থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। এখন তো খতনা দেখে মুসলমানকে
চিনতে হয়, অথচ এক সময় এমন ছিল যখন মাথা থেকে পায়ের পাতা
পর্যন্ত ইসলামী আলামত দ্বারা ভরা থাকত। যেমন ছিলেন হযরত
সাহাবায়ে কেরামরা।

মুসলমান ছাড়া অন্য কাউকে সালাম করা জায়েয নেই

আজকাল তো সালাম করার জন্যও নাম জিজ্ঞাসা করে পরিচয়
নিশ্চিত হতে হয়, কেননা চেহারা দেখে তো বুঝা যায় না মুসলমান কিনা,
আর মুসলমান ছাড়া অন্য কাউকে তো সালাম করা জায়েয নাই।
মুসলমান জানেই না যে, ইসলামে দাড়ির গুরুত্ব কতটুকু? ব্যস শুধু

এতটুকু জানে যে, দাড়ি রাখা সুন্নত। দাড়িকে একেবারেই গুরুত্বহীন মনে করে মুসলমান। আমাদের মধ্যে আর সাহাবাদের মধ্যে এটাই পার্থক্য যে, তারা সুন্নতের উপর আমল করতেন সুন্নত হওয়ার কারণে আর আমরা সুন্নতকে ছেড়ে দিই সুন্নত হওয়ার কারণে।

এই জন্য তাবলীগের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই কাজের দ্বারা আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে হবে। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ তাআলা এই মেহনতের মধ্যে পরিবেশ এবং একিন বদলানোর বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।

জনৈক মাঝির দাওয়াতে হেদায়াত পাওয়ার ঘটনা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক সাহাবীকে দাঈ বানিয়েছিলেন। আবু জাহেলের পুত্র হযরত ইকরিমা একজন মাঝির দাওয়াতে হেদায়াত পেয়েছিলেন। হযরত ইকরিমা ইসলাম থেকে দূরে থাকার জন্য ইয়ামান অভিমুখে পলায়ন করছিলেন, নৌকায় আরোহন করলে ঝড় উঠল, নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। হযরত ইকরিমা মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন এখন বাঁচার উপায় কি? মাঝি বলল, বাঁচার একটাই উপায় আর তা হল তুমি ইখলাসের সাথে কালেমা পড়ে নাও, হযরত ইকরিমা জিজ্ঞাসা করলেন, কালেমায়ে ইখলাস কি জিনিষ? মাঝি বলল, বল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

হযরত ইকরিমা বললেন, আরে এই কালেমা যদি পড়ব তাহলে ইয়ামানে পালিয়ে লাভ কি? মাঝি এদিকে দাওয়াত দিচ্ছিল আর ওদিকে তার স্ত্রী তীরে দাঁড়িয়ে কাপড় নেড়ে তাকে ডাকছিল। অতঃপর তিনি নবীজীর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এই ঘটনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল একথা বুঝানো যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিটি সদস্যকে দাঈ বানিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম ১০০ ভাগই দাঈ ছিলেন। যার কারণে মানুষেরা দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়েছিল। ইসলাম থেকে বের হওয়ার কোন অবকাশ ছিল না। এই জন্য আপনারা সকলে নিয়ত করুন যে, এই কাজকে আমরা মাকসাদ বানিয়ে করব এবং সমস্ত উম্মতকে এই কাজের উপর উঠাব, এটাও আমাদেরই যিম্মাদারী। তবে একথাও ঠিক যে, আল্লাহ তা'আলা এই কাজ ঐ সমস্ত লোকদের দ্বারাই নেবেন যারা দ্বীনের ক্ষতি বরদাশত

করবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওফাতের পরে আরবের বিভিন্ন প্রান্তে ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। অনেকে মুরতাদ হয়ে গেল, অনেকে যাকাত দিতে অস্বীকার করল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য হযরত উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাঠাতে মনস্থ করলে অনেকে তাকে বাধা দিয়ে বললেন, এই মুহূর্তে মদীনা খালি করা ঠিক হবে না। হযরত আবু বকর (রা.) গর্জে উঠে বললেন, আমি জীবিত থাকব আর দ্বীনের ক্ষতি হবে এটা হতেই পারে না। যদি উম্মাহাতুল মুমিনীনদেরকে দাফন করার মত লোকও না থাকে তবুও আমি এই ফেতনা মোকাবিলা করার জন্য মদীনা খালি করে দিতে প্রস্তুত। এরকমই ছিল দ্বীনের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের জযবা। এখন এসব জযবা খতম হয়ে গেছে। “আল্লাহর দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর আমরা ঘরে বসে থাকব” এমন মর্মে মুজাহিদের আজ বড় অভাব। মনে রাখবেন যতদিন পর্যন্ত উম্মতের মধ্যে নকল, হরকত থাকবে ততদিন পর্যন্ত দ্বীন যিন্দা থাকবে।

এই উম্মতের দাওয়াত ছাড়া মুক্তি নেই

এই জন্য আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে, এই উম্মত দাওয়াত ছাড়া নাজাত পাবে না। এ কথার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই।

কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ইরশাদ করেছেন-

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

উম্মতের প্রতিটি সদস্যের যিম্মায় এই কাজ। চাই সে নিজে আমল করুক বা না করুক। মনে রাখবেন দাওয়াত দেয়ার জন্য আমল করা শর্ত নয়। তবে দাব্বের জন্য আমল করা ভাল। কিন্তু এটা ঠিক না যে, আমল না করলে দাওয়াত দেয়া যাবে না। বরং যে আমল করে না সে আরো বেশি বেশি দাওয়াত দেবে যাতে তার মধ্যেও আমল চলে আসে। হযরত থানবী (রহ.) বলেন, আমি যে জিনিষটা নিজের মধ্যে আনতে চাইতাম অন্যকে তার বেশি বেশি দাওয়াত দিতাম আর যে দোষ নিজের থেকে বের করতে চাইতাম মানুষকে তা থেকে বিরত রাখতাম। এই দুটি কাজ হল নিজের জন্য। এই কারণেই দাওয়াতের জন্য আমল শর্ত নয়। তবে নিজের মধ্যে আমল থাকলে দাওয়াতটা বেশি কার্যকরী হয়। প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হয়। সুতরাং খুব ভাল ভাবে মনে রাখতে হবে

যে, দাওয়াত দেয়া প্রত্যেকের যিম্মাদারী চাই সে আমল করুক বা নাই করুক। দাওয়াতের নিসবতে যতদিন পর্যন্ত নকল-হরকত জারী থাকবে ততদিন পর্যন্ত দ্বীন যিম্মা থাকবে আর উম্মত পবিত্র হতে থাকবে। কেননা, এই রাস্তাটা হচ্ছে পাক হওয়ার। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে- হিজরতের দ্বারা পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যায়।

এক ব্যক্তি ১০০ জনকে হত্যা করে তাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়েছিল। রাস্তায় তার মৃত্যু চলে এল। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যমিনের সমস্ত নেয়ামকে বদলে দিলেন। ১০০টা হত্যা করে সংশোধনের জন্য রওয়ানা হয়েছে কোন আমল করে নাই। নামায পড়ে নাই, রোযা রাখে নাই, তেলাওয়াত করে নাই। কোন আমলই করে নাই। শুধুমাত্র সংশোধনের জন্য কদম উঠিয়েছে এই ভেবে যে, অনেক গোনাহ করেছে। এবার আল্লাহর দিকে ধাবিত হতে হবে। তো তার জন্য আল্লাহ তা'আলা সব নেয়াম বদলে দিলেন। যমিনকে বললেন প্রসারিত হয়ে যাও তার চলার জায়গা থেকে, আর যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে সংকুচিত হয়ে যাও। এর পরে ফেরেশতারা এসে যমিন মোপে দেখল বেশির ভাগ পথ সে অতিক্রম করে এসেছে। কিন্তু বাস্তবতা হল তার সফর তো কেবলই শুরু হয়েছিল। মুহতারাম দোস্ত-বুয়ুর্গ! খুব ভাল করে মনে রাখবেন এই রাস্তায় নকল-হরকত ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য সহায়ক হবে আর মুসলমান মুসলমান হিসাবে বাকি থাকবে। অমুসলিমরা ইসলামে দাখিল হওয়ার আর মুসলমানের মুসলমানিত্ব বাকি থাকার এটাই একমাত্র রাস্তা। হযরত উসামার জামাআত মদীনা থেকে বের হয়ে যে যে এলাকা দিয়ে অতিক্রম করল সেই সব এলাকায় মুর্তাদরা পুনরায় ইসলামে দাখিল হয়ে গেল। তারা ভাবতে লাগল মদীনা থেকে যদি ইসলাম শেষ হয়ে যেত তাহলে সেখান থেকে এত বড় জামাআত বের হত না।

তাশকীল

মুহতারাম দোস্ত-বুয়ুর্গ! এই জন্য এরাদা করি, নিয়ত করি যে, এই কাজ আমাকে করতে হবে এবং সমস্ত উম্মতের নিকট এই যিম্মাদারীকে পৌছে দিতে হবে। হিম্মত করে চার চার মাসের জন্য দাঁড়িয়ে যাই। একে অন্যকে তৈরী করতে থাকি। যত পুরাতন সাথি এই মজমায় আছি সকলে জামাআত তৈরী করে কুরবানীর সাথে বের হয়ে যাই। আসলে তো কুরবানীই মাকসাদ। আর পুরাতনদেরকে ডাকাই হয়েছে এই কুরবানীর জন্য। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন

বয়ান

হযরত মাওলানা সা'দ সাহেব

৬ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং রবিবার সকাল ১০টা

স্থানঃ ইটক্ষীরা, ভোপাল।

(জামা'আত প্রেরণের হেদায়াত)

আমার সম্মানিত বন্ধুগণ! বর্তমান যুগে উম্মত ঈমান ও ইসলাম মেহনত এবং চেষ্টা ব্যতীত অর্জন করতে চায়। মেহনত ব্যতীত দুনিয়া অর্জন করাকে মানুষের জ্ঞান সমর্থন করে না। এটাকে নিয়ম বহির্ভূত মনে করে। মানুষ এমনও মন্তব্য করে যে, দুনিয়া মেহনত ছাড়া অর্জন করা সম্ভব না। তাহলে চিন্তা করুন দুনিয়া যদি মেহনত ছাড়া অর্জন করা সম্ভব না হয়, তাহলে দ্বীন শুধু দুআ আর ভিতরে ভিতরে অর্জন হতে পারে না। এই জন্য মানুষ ঐ বস্তুর উপর মেহনত করে যার দ্বারা নিজ সমস্যার সমাধান হওয়ার ইয়াকীন হয়। যার দ্বারা নিজ সমস্যার সমাধান হওয়ার ইয়াকীন না হয় সে ঐ লাইনে মেহনত করে না। আমার বন্ধুগণ! যেই লাইনে মেহনত করা হয় সেই লাইনের ইয়াকীন অন্তরে সৃষ্টি হয়। যেই লাইনের মেহনত ছেড়ে দেওয়া হয়, সেই লাইনের ইয়াকীনও অন্তর থেকে বের হয়ে যায়।

আমার বন্ধুগণ! এই দুনিয়া যা আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে নগণ্য, অপদস্ত, ক্ষণস্থায়ী যার উপর কোন ওয়াদা নেই, যখন সেটা মেহনত ছাড়া অর্জন হয় না তাহলে ঐ দ্বীন এবং তরীকা যা আল্লাহর নিকট প্রিয়, পছন্দনীয়, চিরস্থায়ী সফলতাদানকারী, যার উপর রয়েছে সকল প্রকার অঙ্গীকার এই দ্বীন কিভাবে মেহনত ও চেষ্টা ব্যতীত অর্জন হবে? আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অঙ্গীকার করেছেন-আমি আমার রাস্তায় মেহনতকারীকে অবশ্যই হেদায়েত দিব। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত হেদায়েত অর্জিত হবে না যতক্ষণ আশিয়ায়ে কেরামের তরীকা মত মেহনত না করা হবে। এই জন্য নবীদের মাধ্যমে সর্বপ্রথম মেহনতের দিক নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমে মেহনতের দিক নির্ধারণ কর তারপর তার ফলাফল।

মেহনততো পরে হবে আগে মেহনতের দিক নির্ধারণ কর যে, কোন লাইনের মেহনতে হেদায়েত আসে। নিজের সকল যোগ্যতা দুনিয়ার কাজে ব্যয় হবে আর হেদায়েত নসীব হয়ে যাবে এটা কোন ভাবেই সম্ভব না। আল্লাহ তা'আলা নবীদের মেহনতকে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য হেদায়েত অর্জন হওয়ার রাস্তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوَالِي اللّٰهُ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعْنِيْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا

اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - يوسف ১০৮

অতঃপর হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাওয়াতের কাজে যে বাধা প্রদান করা হয়েছে এবং যে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ও ঘোষণা দেওয়া হয়েছে-

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُوْنَ - روم: ১০৮

নবীজী! এই রাস্তায় সকল বাধা এবং লোকদের আপনার দাওয়াত গ্রহণ না করা যেন আপনাকে এই পথ থেকে সরিয়ে না দেয়।

আমার সম্মানিত বন্ধুগণ! হযরত বলতেন-শয়তানের সবচেয়ে বেশী শক্তি ব্যয় হয় দাওয়াতের কাজ থেকে বাধা দেয়ার ক্ষেত্রে। যদি এই উম্মত দাওয়াতের উপর এসে যায় তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তি তাদেরকে মুক্তির পথ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। এই জন্য শয়তান সর্ব প্রথম দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। আপনারা শুনে থাকবেন যে, যখন আযান দেয়া হয় তখন শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করতে থাকে। হাদীছে এসেছে পলায়ন করার সময় তার এমন খারাপ অবস্থা হয় যে, ভয়ে বাতাস ছাড়তে ছাড়তে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে দায়ী থেকে পলায়ন করে। অতঃপর যখনই দায়ী দাওয়াত শেষ করে, আযান শেষ হয়ে যায় তখন শয়তান ফিরে আসে। ইকামাতের সময় আবার পালায়। যখন ইকামত শেষ হয়ে যায় তখন শয়তান পুনরায় ফিরে আসে। অতঃপর ইবাদতে বাধা সৃষ্টি করে। ভুলা জিনিস নামাযে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যদি আমার কুমন্ত্রনা দ্বারা তার নামায নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার সমস্ত দ্বীন নষ্ট করার জন্য আমার কোন মেহনতের প্রয়োজন নেই। কেননা তার সমস্ত দ্বীন এমনিতেই নষ্ট হয়ে যাবে। হাদীছ শরীফে

এসেছে- যে নামাযকে নষ্ট করে দিবে সে নিজের সমস্ত ধীনকে নষ্ট করে দিবে। শয়তান তাদের নামায, লেন-দেন, আচার-আচরণ, আখলাখ নষ্ট করার চেষ্টা করে না। শয়তানের চেষ্টা অব্যাহত থাকে নামায নষ্ট করার। যেন সে ধীনের কোন হুকুমের উপর পরিচালিত হতে না পারে। কেননা সহীহ রেওয়াতে আছে যে ব্যক্তি নামাযকে নষ্ট করে দিবে সে গোটা ধীনকে ধ্বংস করে দিবে। যদি নামায সহীহ হয়ে যায় তাহলে সমস্ত আমল সহীহ হয়ে যাবে।

আমার প্রিয় বন্ধুরা! আমি বলছিলাম এখানে শয়তানের সবচেয়ে বড় চেষ্টা থাকে দাওয়াত থেকে বিরত রাখা। যদি উম্মত দাওয়াতের কাজে অটল থাকে তবে ইয়াকীনের পরিবর্তনের কারণে তার আমল এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যে, সে আমার পাতা ফাঁদে পা দিবে না।

এই জন্য আমার বন্ধুরা! একথা ভালভাবে জেনে নিন যে, আল্লাহর দিকের দাওয়াত ইবাদতের মধ্যে পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করার জন্য। শয়তানের নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় আমল দাওয়াতের আমল। ইবাদতের মধ্যে বাধা দেয়ার জন্য শয়তান পুনরায় চলে আসে। এই জন্য দাওয়াত সর্বদা চালু রাখতে হবে। দাওয়াত ও আমল চালু রাখলে শয়তানের ধোকা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে।

إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - زخرف: 43

আপনি সঠিক রাস্তায় আছেন
আপনি সঠিক রাস্তার পথ প্রদর্শক
আমার রবও সঠিক রাস্তার উপর,
যে সঠিক রাস্তায় চলবে সে রব পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

এই আয়াতের তাফসীর উলামায়ে কেরাম এটাই করেছেন-যে ব্যক্তি সঠিক রাস্তায় চলবে সে রবকে পাবে।

এই জন্য আমার প্রিয় বন্ধুরা! প্রথমে এই মেহনত নিজের জাত থেকে করার সিদ্ধান্ত নিন। কেননা আল্লাহর জাতের সাথে সম্পর্ক করা এবং এই ধীন নিজের জীবনে আসা এই মেহনত দ্বারাই হবে। সুতরাং জীবনের মূল লক্ষ্য বস্তু বানিয়ে এই মেহনত নিজের জাত থেকে করার সিদ্ধান্ত নিন। এটা প্রথম শর্ত। এই মেহনত দ্বারা নিজের আত্মশুদ্ধি,

নিজের সংশোধন, নিজের তরবিয়ত: আল্লাহর জাতের সাথে সম্পর্ক রাখার যোগ্যতা হাসিল হবে। অন্তরে ইয়াকিন সৃষ্টি না হলে দাওয়াতের আমলকে হালকা মনে করে ছেড়ে দেয়া হবে। অথচ দাওয়াতের আমল নবুওয়তের আমল। যা হেদায়াতের জন্য, আত্মতৃষ্টির জন্য, তরবিয়তের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। এই জন্য হযরত রঃ বলতেন- যে জিনিস নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে চাও আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে তা বেশী বেশী কর। কেননা দাওয়াত নিজের জাতের জন্যই হয়ে থাকে। দায়ীর জন্যতো দাওয়াত সর্বাবস্থায়ই উপকারী। এই জন্য স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহর শাস্তি থেকে, তার পাকাড় থেকে ভয় দেখানো এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সওয়াব এবং তার পুরস্কারের প্রতি উৎসাহ দেয়া এ দুটির উপকার দাওয়াত প্রদানকারীর তো অবশ্যই হবে।

আল্লাহর শাস্তি থেকে ভয় দেখানো, নিজের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করার জন্য। দাওয়াত দায়ীর নিজের ফায়দার জন্য। যদি আমাদের এই রাস্তায় চলাফেরা অন্যের সংশোধনের জন্য হয় তাহলে আমাদের কাজ ছেড়ে বসে থাকতে হবে। কারণ তখন বলব যে, আমরা পৌঁছিয়ে দিয়েছি এখন আর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ অনেক চেষ্টার পরও লোকেরা পালন করছে না।

“দাওয়াত” স্বয়ং দায়ীর জন্য

আমার প্রিয় বন্ধুরা! দাওয়াততো নিজের জাতের জন্য। আপনারা হয়ত দেখে থাকবেন যে, যত ব্যবসায়ী রয়েছে চাই সে ফেরী করে বিক্রি করুক অথবা দোকানে বসে বিক্রি করুক তারা ব্যবসায়ী পণ্য শুধু নিজের উপকারের জন্যই দেয়। লোকেরা তার দাওয়াত শুনে তার পণ্য ক্রয় করে। এতে তার লাভ হয়। কোন ব্যবসায়ী অন্যের জন্য ব্যবসা করে না। প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজের লাভের জন্য ব্যবসা করে।

অবিকল এভাবেই বুঝে নিন যে, এই দাওয়াত শুধু নিজের জাতের জন্য, নিজের ভিতরে আছর সৃষ্টি করার জন্য অন্যকে দাওয়াত দিন। আর দাওয়াতের আছর হল ইয়াকীন সৃষ্টি করা।

আমার প্রিয় বন্ধুরা! আমাদের সর্ব প্রথম মেহনত করতে হবে কালিমার দাওয়াতের উপর এবং এভাবে মেহনত করতে হবে যেন কালিমার ইখলাস অর্জন হয়। কালিমার ইখলাস হল- কালিমা **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**

-এর পাঠকারীকে সকল হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হল- হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কালিমার ইখলাস কি? হুজুর সা: বললেন-তার ইখলাস হল এই যে, এই কালিমা পাঠকারীকে হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে। এই জন্য আমাদেরকে কালিমার দাওয়াত দিয়ে কালিমার ইখলাস সৃষ্টি করতে হবে। এই কালিমার দাওয়াতের এক পরিবেশ তৈরী করতে হবে। তার পন্থা হল মসজিদে ঈমানের হালকা বানাতে হবে।

এতে গায়েবের আলোচনা হবে, আল্লাহর কুদরতের আলোচনা হবে। মসজিদের সাথিরা লোকদের সাথে সাক্ষাত করে নগদ মসজিদে নিয়ে আসার মেহনত করবে, তাদেরকে ঈমানের হালকায় বসানোর চেষ্টা করবে। প্রত্যেকের নিকট ভিন্নভাবে গিয়ে বলবে- ভাই মসজিদে ঈমানের হালকা কায়ম আছে আপনিও তাশরীফ রাখেন।

আমার প্রিয় সাথীরা! মূলত ঈমানের কথা তখনই বুঝে আসে যখন মানুষ দুনিয়া এবং গায়রুল্লাহর পরিবেশ থেকে বের হয়ে বাহিরে আসে। এই কালিমা اَللّٰهُ اَكْبَرُ এর ইখলাস অর্জন করার যে প্রথম মাধ্যম, আমি তা আপনার নিকট আরজ করছি। কেননা আমাদের লক্ষ্য হল সমস্ত বিশ্বের সকল মসজিদে মসজিদে নববীর কাজ চালু করা। কেননা মসজিদে নব্বীতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা রুহানী কাজ এমনভাবে ক্রমান্বয়ে পরিচালিত হত যে, যখনই কেউ মসজিদে প্রবেশ করত সে মসজিদে কাউকে না কাউকে পেত। এক সাহাবী বলেন, আমি যখন মসজিদে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আসি তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদের মাঝে বসে আল্লাহর ওয়াদার কথা শুনাচ্ছিলেন।

ওয়াছিলা ইবনে আসকা (রা.) বর্ণনা করেন, যখন আমি হিজরত করে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আসলাম তখন এসে সোজা নামাযে শরীক হয়ে গেলাম। আমি শেষ কাতারে ছিলাম। যখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাম ফিরিয়ে আমাদেরকে দেখলেন তখন আমার নিকট তাশরীফ নিয়ে এলেন।

লক্ষ্য করুন, আমার কথা খুব ভালভাবে শ্রবণ করুন। মূলত আমার মুযাকারা ঐ পুরাতন সাথীদের সাথে যারা এখন পর্যন্ত এটা মনে করে

বসে আছে যে, মসজিদ খালি রেখে শুধু সাক্ষাত করে নিব। ঘ্রীনের কথা বাজারে বলে দোকানে চলে যাব। অথবা ঘ্রীনের কথা বাজারে করব এবং নিজ দফতরে চলে যাব।

মসজিদের জামা'আতের উচিত নিজে মসজিদ ওয়ালা হয়ে মসজিদ থেকে বের হবে। এক একজনকে মসজিদ ওয়ালা বানানোর উদ্দেশ্যে সাক্ষাত করবে। যেন মসজিদে দাওয়াতের আমল চালু হয়। সাক্ষাত করে প্রত্যেক ঈমানদারকে মসজিদে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। তাদের সাথে সাক্ষাত করে বলতে হবে মসজিদে ঈমানের, ইয়াকীনের হালকা চলছে আপনিও তাশরীফ রাখুন। যদি তিনি শুধু দশ মিনিটের জন্যও তৈরী হন তাহলে তাকে মসজিদের পরিবেশে নিয়ে আসুন। বাজারের পরিবেশ থেকে মসজিদের পরিবেশ লক্ষগুণ উত্তম। কেননা তার কয়েক কদম মসজিদের দিকে উঠানো আল্লাহ তা'আলার দিকে পা উঠানোর অন্তর্ভুক্ত।

ঐ হালকা পরিচালনাকারী সাথি নির্ধারিত করে বাকী সাথীরা সাক্ষাতের মাধ্যমে সবাইকে মসজিদে নিয়ে আসবে যে, মসজিদে ঈমানের হালকা চলছে। তা'লীমের হালকা চলছে। দশ মিনিটের জন্য হলেও যেন তিনি তাশরীফ নিয়ে আসেন। যদি তিনি কয়েক কদম মসজিদের দিকে উঠান তখন আল্লাহ তা'আলার রহমত, বরকত ও মাগফিরাত তার দিকে দ্রুত ধাবিত হতে থাকে।

হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার দিকে হেটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই। যদি আমরা সাক্ষাত করে ঈমানদারকে মসজিদের দিকে নিয়ে আসতে পারি তখন বুঝতে হবে তার জন্য হেদায়াতের দরজা খুলে গেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দিকে দৌড়ে আসে তাকে আল্লাহ তা'আলা কেন হিদায়াত দিবেন না?

ঈমানদারকে মসজিদে এনে মসজিদ আবাদ করতে হবে

লক্ষ্য করুন! আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আরজ করছি। এটা প্রথম নাযারের প্রথম কাজ। যারা অন্যান্য প্রদেশ থেকে এখানে (ভুপাল) এসেছেন, তারাও খুব ভাল ভাবে বুঝে রাখুন। আমাদের সাক্ষাতের

উদ্দেশ্য ঈমানদারকে মসজিদে এনে মসজিদ আবাদ করা। কেননা, এটা মসজিদ আবাদ করার মেহনত। এখনতো ব্যাপকভাবে সাধীদের এই জেহেন তৈরী হচ্ছে যে, তারা ঘরেই সাক্ষাত করে এবং ঘরের পরিবেশেই সব কথা বলে থাকে। মসজিদে নিয়ে আসার মেহনত এবং মসজিদে নিয়ে আসার চেষ্টার জয়বা তাদের মধ্যে নেই। লোকদেরকে ঘরের মধ্যে একত্রিত করে আধা ঘন্টা, এক ঘন্টা কথা বলে। এখনতো মানুষেরও এই জেহেন তৈরী হয়ে গেছে যে, আমাদের সাথে আমাদের পরিবেশেই কথা বলুন।

হযরত বলতেন- যে নিজ পরিবেশ থেকে বের হয়ে বাহিরে আসে নাই, সে ঈমান এবং ইয়াকীনের পরিবেশ দ্বারা কিভাবে প্রভাবান্বিত হবে। এই জন্য তাকে তার পরিবেশ থেকে বের কর। প্রত্যেকের সাথে সাক্ষাত কর। সাক্ষাতের ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করো না যে, আমাদের মহল্লায় জামাতের সাথি কারা? তাদের সাথে সাক্ষাত করব।

হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সকল মানুষের নিকট পাঠানো হয়েছে। এই কাজ যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হয় তাহলে সকল উম্মতেরও বটে। যদি আপনারা এই ভেবে সাক্ষাত করেন যে, সে আমাদের জামাআতের লোক তাহলে এর দ্বারা দল সৃষ্টি হবে, উম্মত হবে না। এই জন্য এ কথা খুব স্মরণ রাখবেন যে, এটা মসজিদ আবাদ করার মেহনত। ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাত করুন। কেননা, মসজিদ আবাদ রাখা প্রত্যেক ঈমানদারের কাজ। আল্লাহ তা'আলা এটা বলেন নাই যে, শুধু তাবলীগ জামাতের লোকেরা মসজিদ আবাদ করবে।

إِنَّمَا يَغُورُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى

الرَّكَاعَةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ - توبه: ১৮

মসজিদ আবাদকারী শতভাগই ঈমানদার লোকেরা। এটা কখনো ধারণা করা ঠিক হবে না যে, মসজিদের জামাত বলতে তাবলীগ জামাতকেই বুঝায়। শতভাগ ঈমানদার লোকেরাই মসজিদ আবাদ করে।

এই জন্য আমার সম্মানিত বন্ধুরা! প্রত্যেক ঈমানদার লোকই আমাদের উদ্দেশ্য। সাক্ষাত করে তাদেরকে মসজিদের পরিবেশে নিয়ে

আসব। কেননা, মসজিদের পরিবেশ তরবিয়তের জন্য, হেদায়াতের জন্য, অন্তরে কথা ভালভাবে বসানোর জন্য। তাই প্রত্যেকের সাথে সাক্ষাত করুন।

প্রত্যেকে মসজিদে এনে দাওয়াত দিন। মহল্লায় কারো সাথে সাক্ষাত হলে তাকে বলুন, ভাই! ঈমানের হালকা চলছে। আপনি তাশরীফ রাখুন। এটা কালিমার (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) প্রথম সাক্ষাত। তার সাথে মসজিদ আবাদ করার যে কাজ তা ঈমানের হালকা। সাক্ষাত এই জন্য করতে হবে যেন সাক্ষাত করে তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসা যায়। এখন মসজিদের পরিবেশে এনে দাওয়াত দিন, জেহেন তৈরী করুন। আমি গতকাল রাতে বিস্তারিত আরজ করেছিলাম যে, ঈমানের হালকায় কিভাবে ঈমান শিখতে হবে? কি কথা বলতে হবে? ঈমানের আলামত বলবে যেন এর দ্বারা উম্মতের ভিতর ঈমানের দুর্বলতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এটাই মসজিদ আবাদের প্রথম কাজ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-মসজিদ আবাদকারীদের অন্তর থেকে আমি গাইক্বাহর ভয় বের করে দিব। হাদীসে এসেছে, মসজিদ আবাদকারীদের থেকে আল্লাহর আযাব উঠিয়ে দেয়া হয়।

মসজিদ আবাদকারীদের জন্য পাঁচটি ওয়াদা

হাদীসে এসেছে মসজিদ আবাদকারীদের প্রতি ৫টি ওয়াদা রয়েছে।

- (১) তাদের উপর রহমত নাযিল করেন (২) আল্লাহ তা'আলা শান্তি দেন
- (৩) আল্লাহ সম্বল্ট থাকেন (৪) তাদেরকে বিজলীর গতিতে পুলসিরাত পার করবেন (৫) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

আল্লাহ তা'আলা মসজিদ আবাদকারীদের সাথে এই পাঁচটি ওয়াদা করেছেন।

এই জন্য আমার সম্মানিত বন্ধুগণ! এ সকল কল্যাণ অর্জন করার জন্য আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে এই সিদ্ধান্ত করে নেই যে, প্রত্যেক কমপক্ষে আড়াই ঘন্টা মসজিদ আবাদ করার জন্য বের করব। লক্ষ্য করুন আমি আপনাদেরকে সকল সমস্যার সমাধান বলে দিচ্ছি। যদি উম্মতের উপর আগত আযাব ফিরাতে হয় তাহলে তার রাস্তা এটাই। কেননা, আল্লাহ মসজিদ আবাদকারীদের থেকে আযাব উঠিয়ে নেন। যদি এই মসজিদ আবাদকারীরা নিজ দুনিয়াবী কোন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য

মসজিদ থেকে বের হয় তখন ফেরেশতারা দুনিয়াবী কাজে সাহায্য করেন। আর আমরা চিন্তা করি-

(১) যদি আমরা মসজিদে সময় দেই তাহলে আমাদের দোকানের কি অবস্থা হবে? (২) যদি মসজিদে সময় দেই তাহলে দফতরের কি হবে? (৩) যদি মসজিদে সময় দেই তাহলে কারখানার কি অবস্থা হবে?

পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-যদি মসজিদ আবাদকারীরা কোন কাজের জন্য মসজিদ থেকে বের হয় তখন ফেরেশতাগণ দুনিয়াবী কাজে সাহায্য করেন এবং তাদের সঙ্গ দেন। এটা কত বড় সাহায্য হবে। একদিকে দুনিয়াবী কাজ আর সাহায্যকারী হলেন ফেরেশতাগণ, সুতরাং মসজিদের ভিতর আমাদের ঈমানের হালকা এভাবে কায়েম করতে হবে যে, আল্লাহর কুদরত, গায়েবের আলোচনা খুব করতে হবে। যেন আমাদের ইয়াকীন সকল দৃশ্যমান অভিজ্ঞতা ও দুনিয়ার আসবাব থেকে ফিরে আমলের দিকে ধাবিত হয়। অনুরূপভাবে আমার বন্ধুরা! এটা মসজিদ আবাদ করার প্রথম কাজ। যখন কেউ মসজিদ থেকে বের হয়ে আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে তখন দায়ীর ইয়াকীনও বাহ্যিক আসবাব থেকে ফিরে আল্লাহর দিকে ধাবিত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আসবাবের মুকাবেলায় নামায পেশ না করব ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযের উপর আসতে পারব না। কেননা, সে যে ধান্দা নিয়ে বসে আছে তা তার নিকট নামায থেকে বেশি ইয়াকীনী। যে বিষয় তার নিকট ইয়াকীনী না তার পরিবর্তে সে ইয়াকীনী বিষয় কিভাবে ছেড়ে দিবে।

আমল দ্বারা সমস্যার সমাধান হওয়ার দাওয়াত

আমার সম্মানিত বন্ধুরা! আমাদের এখানে শুধু আমলের দিকে আহ্বান করাই উদ্দেশ্য না; বরং আসবাবের মুকাবেলায় আমলের দিকে আহ্বান করা আমাদের লক্ষ্যবস্তু। যদি তিনি আমলের উপর এসে যান তাহলে আমরাও তার আমলের সওয়াব পাব। যদি আমলের উপর না আসে তাহলে আমাদের নিজ আমলের উপর ইয়াকীন সৃষ্টি হবে। আমরা আমলের দিকে আহ্বান করছি নিজের ভিতর আমলের মাধ্যমে সফলতার ইয়াকীন সৃষ্টি করার জন্য।

সম্মানিত বন্ধুরা! নামাযের দিকে আহ্বান করুন সমস্ত কায়েনাতে মুকাবেলায়। প্রত্যেক নামাযের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করার ইয়াকীনের

দাওয়াত দিন। হযরত বলতেন-দুই নামাযের মাঝে সাক্ষাতের জন্য সময়
বের কর পরবর্তী নামাযে পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করার জন্য। এই জন্য খুব
ভাল ভাবে স্মরণ রাখবেন! সাক্ষাতের সময় নামাযের দিকে দাওয়াত
দিতে হবে। নামাযের মাধ্যমে সফলতার ইয়াকীনের বুনিয়াদের উপর
দাওয়াত দেওয়া।

সম্মানিত বন্ধুরা! লক্ষ্য করুন দাওয়াতের দৃঢ়তা তখনই হবে যখন
নিজ নামাযকে ইয়াকীনী বানানোর জন্য নামাযের দিকে আহবান করতে
থাকবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সকল বেনামাযীকে নামাযে নিয়ে
আসতে হবে।

কিন্তু এই কাজে এই মেহনতে দৃঢ়তা তখনই হতে পারে যখন এই
নামাযের দিকে আহবান করা হবে। নিজের নামাযকে ইয়াকীনী বানানোর
জন্য এতটুকু অবশ্যই করতে হবে যে, যখন নামাযের দাওয়াত দিব
তখন নামাযের মাধ্যমে সফলতার ইয়াকীনের দাওয়াত দিব। যদি
নামাযের উপর এসে যায় তাহলে আমরা তার নামাযের সওয়াব পাব।
যদি সে নামাযের উপর না আসে তাহলে আমরা নিজ নামাযের মধ্যে
উন্নতি করব। এটা হল নামাযের দিকে দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্য যে,
নামাযকে ইয়াকীনী বানানোর জন্য নামাযের দিকে আহবান করুন।

দ্বিতীয় কাজ হল নিজ নামাযের মশক করতে হবে। আল্লাহ মাফ
করুন নামাযে তাড়াহুড়া করা ব্যাপক হয়ে গেছে। লোকেরা নামাযের
মধ্যে খুব তাড়াহুড়া করে। রুকুতে, সেজদায়, কওমায়, বৈঠকে তাড়াহুড়া
করা ব্যাপক হয়ে গেছে। মানুষের মেয়াজে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আমরা
ভাল ভাল নামাযী এবং পুরাতন নামাযীদেরকে দেখেছি যে, তাদের মধ্যে
কওমা, জলসার কোন গুরুত্ব নেই। অথচ কঠিন ধমকী এসেছে যে,
“আল্লাহ তা’আলা এমন নামাযীর দিকে তাকান না, যে রুকু-সেজদার
মাঝে অর্থাৎ কওমায় নিজ কোমর সোজা করেনা।”

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةٍ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

অর্থ : আল্লাহ তা’আলা এমন ব্যক্তির নামাযের দিকে তাকান না, যে
রুকু সেজদার মাঝে কোমর সোজা করে না।

এই জন্য সম্মানিত বন্ধুরা! আমাদের এটা মশক করতে হবে। যদি এই নামাযের উপরই মৃত্যু বরণ করি তাহলে কিয়ামত দিবসে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীনের উপর উঠানো হবে না।

হযরত হুযাইফা (রা.) দামেশকের জামে মসজিদে এক লোককে নামায পড়তে দেখলেন। সে নামায খুব দ্রুত পড়ছিল। তিনি দেখে বললেন, নামায কতদিন যাবত পড়ছ? তিনি উত্তর দিলেন চল্লিশ বৎসর যাবত নামায পড়ছি।

হুযাইফা (রা.) বললেন, যদি তুমি এই নামাযের উপরই মৃত্যু বরণ কর এবং নিজ নামাযের মধ্যে স্বীকৃতি সৃষ্টি না কর, তাহলে কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনিত দ্বীনের উপর তোমাকে উঠানো হবে না। কেননা, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীন হল, এভাবে নামায পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখ।

এটা হুযাইফা (রা.) বললেন, কাকে বললেন? ঐ ব্যক্তিকে বললেন, যিনি চল্লিশ বৎসর যাবত নামায পড়ছিলেন। সুস্পষ্ট কথা যার নামায এক সাহাযী দেখছিলেন নিঃসন্দেহে তিনি তাবেয়ী তো অবশ্যই হবেন। তাকে দেখে তিনি বললেন, যদি তুমি এই নামাযের উপর মৃত্যু বরণ কর তাহলে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীনের উপর তোমাকে উঠানো হবে না।

এই জন্য আমার সাথী ভাইয়েরা! হাদীসের মধ্যে নামাযে তাড়াহুড়া করা এবং নামাযকে নষ্ট করার ধমকী দেখুন।

আমরা অনুধাবন করতে পারিনা যে, আমাদের পার্থিব জীবনে কত সমস্যা রয়েছে। এসবই নামায নষ্ট করার কারণে। কত অসুস্থতা রয়েছে। নামায নষ্ট করার কারণেই অসুস্থতা সৃষ্টি হয়। কেননা, যে শরীর ইবাদতের জন্য তৈরী হয়েছে, যদি ঐ শরীর দ্বারা ইবাদতকে নষ্ট করে দেয়া হয়, তাহলে শরীরের ভিতর অসুস্থতার লাইনে সমস্যা দেখ দিবে। হযরত (রহ.) বলতেন- প্রত্যেক অঙ্গের অসুস্থতার প্রথম কারণ ঐ অঙ্গের ভুল ব্যবহার। চোখ, জিহবা, কান, হাত, পা, দেমাগ, লজ্জাস্থান প্রভৃতির ব্যবহার যখন আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির বিপরীত হয় তখন ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অসুস্থতা দেখা দেয়।

হ্যাঁ আমার প্রিয় সাথীরা! অসুস্থতার সম্পর্ক আমলের সাথে। বাহ্যিক কোন কারণের সাথে নয়। এই শরীর ইবাদতের জন্য তৈরী করা হয়েছে। এই শরীরকে ইবাদত দ্বারা সজ্জিত করুন। আমার ভাইয়েরা! আমরা সর্ব প্রথম নিজ নিজ নামাযের মশক করি। লম্বা লম্বা রুকু ও সিজদার মশক করি।

আল্লাহর রাস্তায় বের হলে খুব সুযোগ সৃষ্টি হবে। কেননা আল্লাহর রাস্তায় চাকরী, দোকান, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, দফতর, কারখানা সাথে থাকবে না। আমরা সারা দুনিয়ার সকল ব্যস্ততা থেকে বের হয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছি। এই জন্য নিজ নামাযের মশক করার এই উত্তম সুযোগ। আর এমন নামাযই আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের কাম্য। কেননা হযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নামায এভাবে পড় যেভাবে আমাকে পড়তে দেখ। আর এটাই একমাত্র নামায।

নামাযের বন্টন

বর্তমানে লোকেরা নামাযকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। এটা মাশায়েখদের নামায, এটা উলামাদের নামায, এটা সাধারণ লোকদের নামায, এটা ব্যবসায়ী ও দোকানদারের নামায। চলো ভাই যে যেরকম নামায পড়ছে এটা তার জন্য ঠিক। শাইখ, আলেম, মুহাদ্দিস, বড় বুয়ুর্গ, পীর সাহেব যেমন নামায পড়ছেন তার জন্য এই নামাযই সমীচীন কিন্তু আল্লাহর শপথ! আল্লাহর নবী নামাযকে ভাগ করেন নাই। আমি নামাযকে কিভাবে ভাগ করব। আমি কিভাবে বলব? কিভাবে বুঝাব? আমি একদিন নামায পড়লাম। পরদিন এক সাথী বললেন, আমার একটু তাড়া আছে, তাই আজ মুত্তাকীদের নামায পড়াবেন না। আমি বললাম আমি কি আপনাকে পাপীদের নামায পড়াব? ঐ নামায কেমন হয় আমাকে বলে দিন। অধিকাংশ শিক্ষিত লোকও এই রোগে আক্রান্ত। তারা নামায খুব দ্রুত আদায় করে। কঠিন ধর্মকী এসেছে যে, নামায আল্লাহ তা'আলার নিকট বদ দু'আ করে। “হে আল্লাহ! আপনি তাকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিন যেমন সে আমাকে ধ্বংস করেছে। নামাযী নামাযের পর দু'আ করে আর নামায নামাযীর জন্য বদ দু'আ করে। নামাযের বদ দু'আ তার দু'আর পূর্বেই কবুল হয়ে যাবে।

অথচ নামাযের পর দু'আ কবুল হওয়ার কথা রয়েছে। এর কারণ হল নামায মাজলুম এবং নামাযী জালেম। মাজলুমের বদ দু'আ আর আল্লাহ তা'আলার মাঝে কোন পর্দা নেই। জালেম এবং আল্লাহ তা'আলার দু'আর মধ্যে প্রতিবন্ধক রয়েছে। দু'আ কবুল না হওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় জ্বলুম হল সে আল্লাহ তা'আলার হুকুম নষ্ট করে ফেলেছে।

পুনরায় নামায পড়, তুমি নামায পড়নি

এই জন্য আমার প্রিয় বন্ধুরা! আজ থেকে এটা সিদ্ধান্ত করে নিন যে, ইনশাআল্লাহ আমরা নামায কায়েম করব। হ্যাঁ এটা করব না যে, কোন নামায পড়ব না। নামায তো একটিই। যখন হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের সামনে নিজ মসজিদে দ্রুত নামায আদায়কারীকে দেখে বারবার বলছিলেন-“তুমি পুনরায় নামায পড় কেননা তুমি নামায পড়নি।”

সুতরাং আমার সাধীরা! বর্তমান যুগে কেউ এটা কিভাবে বলতে পারে যে, হ্যাঁ তুমি নামায ঠিক পড়েছ। যতক্ষণ পর্যন্ত এই নামায মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তরীকা অনুযায়ী না হয়। যখন হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে সাহাবীকে দেখছিলেন এবং বারবার বলছিলেন “যাও নামায পড়, কেননা তুমি নামায পড়নি।” এই হাদীসের কারণে হযরত আয়েশা (রা.) হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) সহ অনেক সাহাবা এবং কোন কোন ইমামদের মাজহাব এই যে, যে ব্যক্তি দ্রুত নামায আদায় করবে তার নামায আদায় হবে না। তাকে দ্বিতীয়বার নামায আদায় করতে হবে। কোন কোন ইমামের মতে যদি একবারও জলসার মধ্যে ইসতিগফার না পড়ে তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এবং তা পুনরায় পড়তে হবে। কেউ দুই সেজদার মাঝে জলসার মধ্যে বসে ইসতিগফার পড়ার ইহতিমাম করে না। রুকু থেকে উঠার পর- رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا এই বাক্যগুলো বলতে হয় লোকদের সে খবরও নেই। বাক্যগুলো সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। আমার সম্মানিত বন্ধুরা! শুধু বৎসরে একটি চিল্লা লাগানো, মাসে তিন দিন লাগানো এটা কোন বিষয় নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই মেহনতের মাধ্যমে নামাযের এক এক অংশের মধ্যে এবং এক এক জিকিরের উপর কায়েম না থাকব, ততক্ষণ পর্যন্ত

আমাদের এই মেহনত দ্বারা ঐ জিনিস অর্জন হবে না যা আল্লাহ তা'আলা এই মেহনতের মধ্যে রেখেছেন। এখনতো ব্যাপকভাবে মানুষের এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে যে, তারা এই জিকিরগুলো নিজেও পড়ে না এবং অন্যদেরকেও পড়তে বলে না। অথচ হযরত হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক ঐ জিকিরগুলো নামাযে পড়া প্রমাণিত। ঐ জিকিরগুলোর গুরুত্বারোপ করা এই জন্যই প্রয়োজন যে, নামাযের যে অংশে জিকির রয়েছে ঐ জিকির আদায় না করলে নামাযের ঐ অংশের দু'আ হবে না। তখন ঐ আমলও কবুল হবে না।

জলসা কায়েম হবে জলসার জিকির দ্বারা, কওমা কায়েম হবে কওমার জিকির দ্বারা। যেমনিভাবে সেজদা কায়েম হয় কমপক্ষে তিনবার সিজদার জিকির - سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى পড়ার দ্বারা। আমি বলতে চাচ্ছি যে, নামাযের যে অংশের জিকির ছেড়ে দেয়া হবে নামাযের সে রুকন শেষ হয়ে যাবে। এই জন্য আমাদের স্মরণ রাখতে হবে ঐ জিকিরগুলোর গুরুত্বারোপ করা নামায কায়েম করার জন্য জরুরী। অনেকে বলে এই জিকিরগুলো জরুরী না। লক্ষ করুন নামায কায়েম করা জরুরী। নামায কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত রুকনের মধ্যে ঐ জিকিরগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ না করা হবে। এই জন্য জনৈক সাহাবী যখন পিছন থেকে এই বাক্যগুলো বললেন- رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায থেকে সালাম ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বাক্যগুলো কে বলেছিল। এক সাহাবী আরজ করলেন হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি বলেছিলাম। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন তোমার এই বাক্যগুলোর সাওয়াব লেখার জন্য ত্রিশজন ফিরিশতা দৌড়ে এসেছে। প্রত্যেক ফেরেশতা চাচ্ছিল যে, এই বাক্যগুলোর জওয়াব আমিও লেখব। অনুরূপভাবে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায সম্পর্কে যে সমস্ত জিকিরের কথা বলেছেন তা নামায কায়েম করার জন্য খুবই জরুরী।

আমার প্রিয় বন্ধুরা! এই সমস্ত জিকিরের প্রতি গুরুত্বারোপের মাধ্যমেই নামায কায়েম হবে। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে প্রথম মেহনত করতে হবে নামায কায়েম করার জন্য। যদি নামায কায়েম হয়ে যায় তাহলে এর মাধ্যমে সমস্ত দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে। তাই এটাই নামাযের

প্রথম মশক হওয়া চাই। নামাযের মধ্যে দ্বিতীয় মশকের বিষয় হল, নামাযের মধ্যে আল্লাহকে দেখে নামায পড়ার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহকে দেখে সিফাতে ইহসান সৃষ্টি করা কাম্য। আল্লাহকে দেখে নামায পড়ার চেষ্টা করুন। এভাবে নামায পড়ুন যে, আমি আল্লাহকে দেখছি। যদি এটা না হয় তাহলে এতটুকু নিশ্চিত যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন। এর নিচে কোন স্তর নেই। এটা নামাযে মশকের দ্বিতীয় বিষয়। প্রথম মশক নামাযের বাহ্যিক ঠিক করা। দ্বিতীয় মশক নামাযের মধ্যে আল্লাহর খেয়াল সৃষ্টি করা। তৃতীয় মশকের বিষয় হল নামাযের মাধ্যমেই সব সমস্যার সমাধান করা।

আমার সম্মানিত বন্ধুরা! দাওয়াতের মেহনতের উদ্দেশ্যই হলো ইয়াকীনকে বাহ্যিক আসবাব থেকে ফিরিয়ে আল্লাহর হুকুমের দিকে নিয়ে আসা। যখন কোন প্রয়োজন সামনে আসবে তখন সর্বপ্রথম আমাদের খেয়াল নামাযের দিকে যাবে। এরকম আমরা কেন করব। লক্ষ্য করুন। এক সাহাবী আরজ করলেন হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি ব্যবসার জন্য বাহরাইন যেতে চাচ্ছি।

হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, প্রথমে দুই রাকাত নামায পড়। ব্যবসা থেকে বিরত রাখলেন না। বললেন প্রথমে দুই রাকাত নামায পড় অতঃপর ব্যবসা কর। সুতরাং নামাযের মাধ্যমে নিজের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করার ইয়াকীন সৃষ্টি করতে হবে। লক্ষ্য করুন এক বেলুন বিক্রেতারও এই ইয়াকীন আছে যে, যদি আমার বেলুন বিক্রি হয়, বাচ্চারা ক্রয় করে তাহলে এর দ্বারা আমার সকল প্রয়োজন পূর্ণ হবে। এই জন্য সে বেলুন নিয়ে অলি গলিতে ঘুরা-ফেরা করে। অতি সাধারণ দুই চার টাকার বেলুন বাচ্চাদের নিকট বিক্রি করার জন্য সে ঘুরা-ফেরা করে। কারণ তার ইয়াকীন হল এটা কোন সাধারণ জিনিস নয়। কোন বাচ্চা হাত লাগালে রাগ হয়। কোন বেলুন ফুটে গেলে নিজের ক্ষতি মনে করে। কারণ এর দ্বারা তার সকল প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার ইয়াকীন রয়েছে। হযরত বলতেন, নামায নষ্ট করার কারণ হল সমস্ত বাহ্যিক আসবাব দ্বারা প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার ইয়াকীন মানুষের রয়েছে। কিন্তু নামাযের মাধ্যমে প্রয়োজন পূর্ণ করার ইয়াকীন নেই।

এই জন্য আমার সম্মানিত বন্ধুরা! নামাযকে এই ইয়াকীনের উপর নিয়ে আসতে হবে যে, নামাযের সাথে আল্লাহ তা'আলার যে ওয়াদা

রয়েছে সেই ওয়াদার ইয়াকীন সৃষ্টি করার জন্য তালীম। খুব ভাল ভাবে অনুধাবন করুন। তালীমের উদ্দেশ্য কি? তা'লীমের উদ্দেশ্য আমলের মধ্যে হিসাব নিকাশ করা যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই আমলের উপর কি দান করবেন? এই ফাযায়েলে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি আমলের উপর যে ওয়াদা করেছেন সে ওয়াদার উপর ইয়াকীন সৃষ্টি করাই তা'লীমের উদ্দেশ্য।

তা'লীমের পদ্ধতি

তা'লীমের পদ্ধতি কি?

তা'লীমের পদ্ধতি হল- “ফাযায়েলে আমাল” “মুস্তাখাব আহাদীস” এই দুটি কিতাব থেকে সব সময় তা'লীম হবে। যে সব মসজিদে দুবার তা'লীম হয় সেখানে এক ওয়াক্তে ফাযায়েলে আমল এবং অন্য ওয়াক্তে মুস্তাখাব আহাদীস তা'লীম হবে। অন্য প্রদেশ থেকে আগত মেহমানরাও একথা নোট করে নিন, যে মসজিদে মসজিদের জামাআত প্রস্তুত আছে। কমপক্ষে আটজন সাথী মসজিদের জামাতে রয়েছেন, তো আমি প্রথমেই অরজ করেছি যে, মসজিদের জামাত সাক্ষাত করে লোকদেরকে মসজিদে নিয়ে আসবে।

আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে দুইবার তা'লীম হবে। সকাল সন্ধ্যা। এক ওয়াক্ত ফাযায়েলে আমাল অন্য ওয়াক্তে মুস্তাখাব আহাদীস। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে দুই কিতাব থেকেই তা'লীমের ইহতিমাম করতে হবে। সকাল বেলা এক কিতাব থেকে পড়া হবে, বিকাল বেলা অন্য কিতাব থেকে পড়া হবে। এক এক হাদীস তিন তিন বার পড়বে। এটা তা'লীমের মসনুন তরীকা।

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন কথা বলতেন, তখন ঐ কথা তিনবার বলতেন। যেন শ্রবণকারী খুব ভাল ভাবে বুঝে। এই জন্য খুব ভাল ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তা'লীমে এক হাদীস তিন তিনবার পড়া হয়। তা'লীমের সময় মাজমার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তা'লীমে ওজুর সাথে বসতে হবে। তা'লীমে এমনভাবে বসতে হবে যেমন নামাযে “আস্তাহিয়াতু” পড়ার সময় বসা হয়। কেননা যত বেশী আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে হাদীসের নূর তত বেশী অর্জিত হবে। হাদীসের নূর দ্বারা আমলের যোগ্যতা সৃষ্টি হবে।

তা'লীমে বসার পদ্ধতি

(১) অযুসহ বসতে হবে (২) হেলান দেয়া যাবে না (৩) মনোযোগী হয়ে বসতে হবে (৪) পরস্পরে কথা বলা যাবে না। যদি আমরা এভাবে তা'লীমের কাজ করতে পারি তাহলে এই তা'লীম হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মসজিদের আমল হিসাবে গণ্য হবে। তখন এই তা'লীম দ্বারা আমাদের মধ্যে আমলের সেই উৎসাহ সৃষ্টি হবে যা হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াদা শ্রবণ করে সাহাবাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদ্যমান নেই। নতুবা এটাতো সেই হালকা, সেই উম্মত, সেই হাদীস, আল্লাহর সেই ওয়াদাই যা হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে শুনাতেন। আমরা এভাবে জমে তা'লীমের হালকায় বসব। সকাল-বিকাল আড়াই/তিন ঘন্টা তা'লীম হবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করে তা'লীম কতক্ষণ হবে? হযরত (রহ.) বলতেন, বাড়িতেও তা'লীম নিম্নে দেড় ঘন্টা হওয়া চাই। আমাদের মসজিদের তা'লীমের অবস্থা হল এই যে, পাঁচ/ দশ মিনিট তা'লীম হয়। লক্ষ্য করুন আমি এর সহজ পদ্ধতি ও তরতীব বলে দিচ্ছি। যিনি তা'লীমের জিম্মাদারীতে থাকবেন তিনি তা'লীম চালিয়ে যাবেন। যদি কিছুক্ষণ পর কেউ উঠে যেতে চায় তাহলে তা'লীমকারী বলে দিবেন যে, যদি আপনি যেতে চান তাহলে যেতে পারেন। তা'লীমের কাজ চলতে থাকবে। এটা বললে ইনশাআল্লাহ প্রত্যেক মসজিদে নিম্নে আধা ঘন্টা তা'লীম অবশ্যই চালু হয়ে যাবে। একদিন “ফাযায়েলে আমল” একদিন “মুনতাখাব আহাদীস থেকে তা'লীম হবে। যদি একবেলা তা'লীম হয়।

যদি দুই বেলা তা'লীম হয় তাহলে একবেলা “ফাযায়েলে আমল” অন্য বেলা “মুনতাখাব আহাদীস” থেকে তা'লীম হবে। তা'লীমের সাথে তা'লীমী গাশতও হবে। যে মসজিদে দাওয়াত তা'লীম এস্টেবল এর কাজ চালু আছে, সেখানে সাক্ষাত করে মসজিদের পরিবেশে লোকদেরকে আনতে হবে।

যে জামাআত আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছে, তারা জামাআতে বের হয়েও তা'লীমী গাশত করবে। যে মসজিদে দাওয়াত তা'লীম এবং এস্টেবলের আমল চালু আছে, সেখানে সাক্ষাত করে মসজিদের

পরিবেশে লোকদের আনতে হবে। মসজিদের যে জামাত আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছে তারা জামা'আতে বের হয়েও তা'লীমী গাশত করবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) যিনি সকল মুহাদিসের ইমাম ছিলেন তিনিও লোকদেরকে গাশতে নিয়ে আসার জন্য মদীনার বাজারে গাশত করতেন। আমার প্রিয় বন্ধুরা! আমাদেরকেও এভাবে সাক্ষাতের মাধ্যমে লোকদেরকে তা'লীমের হালকায় নিয়ে আসতে হবে। বাজারে প্রত্যেক লোকের নিকট গিয়ে দাওয়াত দিতে হবে যে, মসজিদে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস শুনানো হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা শুনানো হচ্ছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মীরাছ বটন হচ্ছে (অর্থাৎ ইলম শিখানো হচ্ছে) তাই আপনিও তাশরীফ রাখুন। এভাবে সাক্ষাত করে লোকদেরকে মসজিদের পরিবেশে নিয়ে আসতে হবে। চাই আপনি নিজ বাড়ীতে থাকুন বা আল্লাহর রাস্তায় থাকুন। সব জায়গায়ই আমাদেরকে তা'লীমের হালকা তৈরী করতে হবে। এই জন্য তা'লীমী গাশত করতে হবে। চাই নিজ বাড়ীতে হোক অথবা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে হোক। সব জায়গায় তা'লীমী গাশতের মাধ্যমে লোকদেরকে মসজিদে আনা, এটাই তা'লীমের মেহনত এবং এটাই তা'লীমের পদ্ধতি।

আমার প্রিয় বন্ধুরা! আমি আরজ করেছি যে, তা'লীমে এক এক হাদীস তিন তিনবার পড়বেন। যদি হাদীস পাঠকারী আলেম হন, মৌলভী হন, আরবী পড়তে পারেন তাহলে অবশ্যই এক দুটি হাদীস আরবীতে পড়বেন। যেন হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র যবানে উচ্চারিত শব্দগুলো সরাসরি কানে পৌঁছে। তার রুহানিয়াত জিন্ন। সেই রুহানিয়াত তরজমাকারীর যবানে আসতে পারে না। এই জন্য যিনি আলেম, আরবী পড়তে জানেন, তিনি হাদীস আরবীতে একবার পড়বেন। তারপর তরজমা তিনবার পড়বেন।

কিতাব শেষ করার চেষ্টা করবেন না। বরং চেষ্টা করতে হবে যা বলা হয় তা যেন শ্রবণকারীদের অন্তরে বসে যায়। তা'লীমের মাঝে মাঝে শ্রোতাদেরকে মনোযোগী করতে হবে। জিজ্ঞাসা করবেন, ভাই কথা বুঝে আসছে? লক্ষ্য করুন নামায ছেড়ে দেয়ার উপর কত বড় শাস্তির কথা এসেছে। ভাই! আপনারা কথা বুঝছেন? লক্ষ্য করুন নামাযের উপর কত বড় সওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। এভাবে তা'লীমের মধ্যে শ্রোতাদেরকে

জিজ্ঞাসা করতে হবে। মনোযোগী করতে হবে। এভাবেই ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে তা'লীমের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার ইয়াকীন শিখতে হবে।

একটি ফাযায়েলের ইলম, অপরটি মাসায়েলের ইলম। মাসায়েলের ইলম উলামাদের থেকে শিখতে হবে। যেখানে যাবেন সেখানেও এবং নিজ বাড়ীতেও উলামাদের যিয়ারতকে ইবাদত মনে করবেন। সর্বক্ষেত্রে উলামাদের থেকে মাসায়েল জিজ্ঞাসা করবেন। হযরত (রহ.) বলতেন, উলামাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে চলা তার ঈমানের প্রমাণ। কারণ যার নিকট ঈমান থাকবে না ইলমের প্রতি তার কোন আগ্রহ থাকবে না। জি-হাদ হাদীস শরীফে ইলম এবং ঈমানকে একসাথে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এক হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে- যে ইলম এবং ঈমান চাবে আল্লাহ তাকে দিবেন। উলামাদের প্রতি ভালবাসা, উলামাদের সংশ্রবে ইলম অর্জন করা ঈমানের আলামত।

এই জন্য আমার সাথীরা! উলামাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে চলবেন। হযরত বলতেন, উলামাদের যিয়ারতকে ইবাদত মনে কর। নিজ বাচ্চাদেরকে ইলমে এলাহী শিক্ষা দাও। আজ সমস্ত মেহনত এবং চেষ্টা বাচ্চাদেরকে ইংরেজী পড়ানোর পিছনে হচ্ছে। আমরা এটা অস্বীকার করছি না। এটাতো একটা প্রয়োজন, মাকসাদ না। যে ইলম মাকসাদ তা হল ইলমে ইলাহী।

প্রত্যেক জিনিসকে ইলম মনে করা সবচেয়ে বড় মূর্খতা

আমার সম্মানিত বন্ধুরা! বর্তমান যুগে সবচেয়ে মূর্খতা হল, লোকেরা প্রত্যেক জিনিসকে ইলম মনে করে বসে আছে। লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি কি পড়ছেন। উত্তর দিবে সাইন্স এর ইলম, ইংরেজীর ইলম, ডাক্তারীর ইলম, ইঞ্জিনিয়ারিং এর ইলম।

তওবা, তওবা- কত বড় মূর্খতা। প্রত্যেক জিনিসকে ইলম বলা কত বড় মূর্খতা। আজ সারা দুনিয়ার শিক্ষিত মুসলমানরাও এই ফেতনার মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেছে যে তারা প্রত্যেক জিনিসকে ইলম মনে করে। আমার প্রিয় বন্ধুরা! না, আজ অন্তরের গভীর থেকে একথা বের করে ফেলুন যে, প্রত্যেক জিনিস ইলম। ইলমতো শুধু ঐটাই যা আমরা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তরীকায় আল্লাহ থেকে চাই। কিন্তু আজ মানুষের অন্তরে এটা বসে গেছে যে, প্রত্যেক জিনিস

শিক্ষা করা ইলম। বিষয়টি একেবারেই এমন নয়। ইলম শুধু এটাই যা আমাদের থেকে আমাদের রব মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তরীকার উপর চান।

আমার সম্মানীত বন্ধুরা! প্রকৃতপক্ষে খালেকের তাহকীক করা হল "ইলম"। মাখলুকের তাহকীক করা হল "ফন"। কবরে যাওয়ার সাথে সাথেই যখন প্রশ্ন হবে "من ربك" তখন যে ব্যক্তি রবকে প্রতিপালকের ইয়াকীন নিয়ে যাবে সে বলবে "ربي الله" (আমার রব আল্লাহ)। এখন থেকেই সফলতার দরজা খুলে যাবে। এই জন্য খুব ভালভাবে জেনে রাখুন প্রত্যেক জিনিসকে ইলম সাব্যস্ত করা যমানার সবচেয়ে বড় মূর্ততা। ইলম তো শুধু এটাই যা আমাদের রব আমাদের থেকে চান। অত্যন্ত নির্বোধ ঐ সমস্ত লোক যারা মনে করে যে, দুনিয়ার সব ধরনের জ্ঞানই ইলম। তার চেয়েও বড় নির্বুদ্ধিতা এই যে, ইলম সম্পর্কিত হাদীছ গুলোকে লোকেরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ততা সৃষ্টি করার জন্য দুনিয়াবী ফুনুনের (জ্ঞান) জন্য ব্যবহার করে। আমার কথা খুব খেয়াল করে শুনতে হবে। যে সমস্ত হাদীছে ইলমে এলাহী শিখার হুকুম দেয়া হয়েছে ঐ হাদীছ গুলোকে দুনিয়াবী ফুনুন (জ্ঞান) শিখার জন্য ব্যবহার করা শয়তানের সবচেয়ে বড় ধোকা। এটা তখন বুঝে আসবে যখন কবরে প্রশ্ন হবে। সমস্ত ফুনুন একদিকে থাকবে। সেখানে ইলম সম্পর্কে প্রশ্ন হবে বল- কে প্রতিপালক হওয়ার বিশ্বাস নিয়ে এসেছ?

এই জন্য আমার সাথী ভাইয়েরা। আজকের মজলিস থেকে এই সিদ্ধান্ত করে নিন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন শুধু এটাই ইলম। এই শরীয়তের উপর আমল করা, তা অর্জন করা এটাই হল প্রকৃত ইলম। কুরআন এবং হাদীছ ব্যতীত যা আছে সবই দুনিয়ার ফুনুন (জ্ঞান)।

স্মরণ রাখবেন, এখন কথা হল যে জ্ঞানের সম্পর্ক জরুরতের সাথে আমরা এর থেকে বাধা দিচ্ছি না। শিক্ষা করুন। কিন্তু এটাকে ইলম মনে করা, এর উপর যোগ্যতা প্রদর্শন করা, শুধু তাই নয় বরং তা অর্জনের উপর সওয়াবের আশা করা এসবই ধোকা। আমার প্রিয় বন্ধুরা! যদি জানকে সামান্য ব্যবহার করেন তাহলেই ইলম কাকে বলে তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর পক্ষ থেকে সফলতার যে তরীকা নিয়ে এসেছেন, সে তরীকার

তাহকীক করাকে ইলম বলা হয়। কেননা সমস্ত ইলম কবরের তিন প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(১) সবকে জানা অর্থাৎ ঈমান (২) নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তরীকা জানা অর্থাৎ শরীয়ত জানা (৩) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জানা অর্থাৎ সুন্নত জানা।

এই তিনটি বিষয়ের তাহকীক করাই ইলম। এছাড়া যা রয়েছে সবই মূর্বতা। এ তিনটি বিষয় সমস্ত ইলমের সারমর্ম। কবরের প্রশ্ন তিনটি। কবরের মধ্যে এই প্রশ্ন হবে না যে, আপনি ডাক্তারী কতটুকু পড়েছেন? সাইন্স কতটুকু পড়েছেন? ইঞ্জিনিয়ারিং এ পাশ করেছেন? কবরে এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন হবে না।

আমার প্রিয় বন্ধুরা! হযরত উমর (রাঃ) একদিন তাউরাতের কিছু কথা শিখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন- হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি তাউরাত শিখে এসেছি। যেন আমার ইলমের মধ্যে বৃদ্ধি হয়। এই কথা শুনে হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমর (রাঃ) এর উপর এত রাগাচ্চিত হলেন যে, তিনি মিথরে বসে গেলেন। সমস্ত সাহাবীরা সমবেত হলেন। আনসাররাতো হজুর এর রাগ দেখে তরবারী নিয়ে এলেন যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কষ্ট কে দিয়েছে? সমস্ত রাগ ছিল উমর (রাঃ) এর উপর। তিনি তাউরাত কেন পড়লেন। হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন হে উমর! যদি আজ মূসা (আঃ) জীবিত হয়ে আসেন তাহলে তাঁর জন্যও আমার তরীকা ছাড়া মুক্তির কোন পথ নেই। যদি তুমি মূসা (আঃ) এর তরীকার উপর চল তাহলে তুমি পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। হেদায়াত পাবে না।

কেননা হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমন সকল নবীদের আগমনের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীয়ত সমস্ত শরীয়তকে এমনভাবে রহিত করে দিয়েছে যেমন প্রত্যেক যমানায় বাচ্চা বড় হতে থাকে এবং তার পূর্বের কাপড় বেকার হতে থাকে। যদি সে ঐ কাপড় পরিধান করে তাহলে তা সংকীর্ণ হবে, ফেটে যাবে, শরীরে সঠিকভাবে লাগবে না। এভাবে মানুষ নিজ শারীরিক গঠনের সাথে এমন এক বয়সে উপনীত হয় যে, এখন মৃত্যু পর্যন্ত এই পোশাক নির্ধারিত হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীয়ত পিছনের সমস্ত শরীয়ত ও তরীকাকে এমনভাবে রহিত করে দিয়েছে যেমন বড় নওজোয়ানের পিছনের সকল কাপড় বেকার হয়ে যায়। এই বিষয়টি আপনার সামনে রেখে চিন্তা করুন এবং অনুধাবন করুন। যে জিনিস ইলম ছিল, মুসা (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি উমর (রাঃ) এর মত সাহাবী শিখেছেন। লক্ষ্য করুন, উমর (রাঃ) ছিলেন কুরআন হাদীছের সর্বপ্রকার ইলমে দক্ষ, সঠিক বিষয় আল্লাহ তা'আলার দক্ষ থেকে তাঁর অন্তরে ইলহাম হত, এই রকম একজন উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী মুসা (আঃ) এর উপর নায়েলকৃত ইলম শিক্ষা করার কারণে নবীজী এত রাগান্বিত হয়েছেন। তাহলে যা ইলম না তা শিক্ষা করে আল্লাহর ইলম থেকে মূর্খ থাকার উপর কিয়ামতের দিন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি রকম রাগান্বিত হবেন।

এই জন্য আমি আপনাদের নিকট আবেদন করছি, আপনারা নিজ বাচ্চাদেরকে দুনিয়াবী বিদ্যা শিক্ষা দিন, কিন্তু এর সাথে সাথে কুরআন এবং ধ্বিনের বুনিয়াদী বিধি বিধান অবশ্যই শিক্ষা দিবেন। নতুবা আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি কিয়ামতের দিন কাউকে না জানার কারণে ক্ষমা করা হবে না। যদি কেউ বলে হে আল্লাহ আমার জানা ছিল না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন- আমি তোমাকে বয়স দিয়েছিলাম শিখার জন্য এবং নবী পাঠিয়েছিলাম শিখানোর জন্য। আল্লাহ তা'আলার নিকট তার কোন ওজর গৃহীত হবে না।

আমার সাথীরা! কোন মসজিদ যেন এমন না থাকে যেখানে সকাল বা সন্ধ্যায় মকতবে বাচ্চাদেরকে কুরআন শিখানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা না হয়। প্রত্যেক মসজিদে কুরআন শরীফের তালীম দেয়া, ধ্বিনের বুনিয়াদী বিষয়াদীর প্রতি গুরুত্বারোপ করা মহল্লাবাসীদের দায়িত্ব। এবং প্রত্যেক মুসল্লীদের দায়িত্ব। লোকেরা বলে শীত এসে গেছে আমাদের মসজিদে গরম পানির ব্যবস্থা করতে হবে। গরম এসে গেছে পাখার ব্যবস্থা করতে হবে। যখন মসজিদকে শারীরিক প্রয়োজনের আসবাব দ্বারা ভরপুর করা হচ্ছে তাহলে যে মসজিদ তৈরী করা হয়েছে ইবাদতের জন্য সেই মসজিদের তাকাজা পূর্ণ করা কি তার জিন্মাদারী নয়? নিজ খরচে মসজিদে মকতবের ব্যবস্থা করা কি মুসল্লীদের দায়িত্ব নয়? আমরা আজ সকলে নিয়ত করে যাব যে, নিজ নিজ মসজিদে মকতবের এহতেমাম করব। আর আমরা যারা নিজ বাচ্চাদেরকে দুনিয়াবী কোন

শিক্ষায় শিক্ষিত করছি তারা এর থেকে ইস্তেগফার ও করে নিই। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে কি জন্য সৃষ্টি করেছিলেন এবং আমরা তাদেরকে কি পড়াচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে মাফ করে দিন। আমরা এই ইলম থেকে সরে তাদেরকে ঐ জিনিস শিক্ষা দিচ্ছি যার জন্য আপনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেন নাই।

হ্যাঁ আল্লাহ তা'আলা তো আমাদেরকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যখন আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন তো আমরা তাঁর ইবাদতের জন্য নিজ শরীরকে কতটুকু ব্যবহার করেছি? সুতরাং আমার প্রিয় বন্ধুরা! একটি কথা ভালভাবে স্মরণ রাখবেন যে, দুনিয়াবী কানুনের উপর ফখর করা কুফরের স্বভাব। যদি মুসলমান ফখর করে তাহলে কুরআনের উপর করবে, হাদীছের উপর করবে, ফিকহের উপর করবে। সে ডাক্তারের মুকাবেলায় ফখর করবে যে, আমার নিকট আল্লাহর ইলম রয়েছে। যদি আপনারা এমন না করেন তাহলে সে দুনিয়াবী ফন অর্জন করে ফখর করবে উলামাদের উপর, বলবে আমার নিকট ফুনুন রয়েছে। সুতরাং স্মরণ রাখবেন দুনিয়াবী ফন শিখে গৌরব করা কুফরের স্বভাব। নবীগণ যখন আল্লাহ তা'আলার ইলম নিয়ে এসেছেন তখন গোত্রের লোকেরা নিজ ফনের মুকাবেলায় নবীদের ইলম নিয়ে ঠাট্টা করেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা ঠাট্টা করার কারণে সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছেন সুতরাং আজ থেকে আমরা এটা সিদ্ধান্ত করে নিই যে, ইলম শুধু ঐটাই যা আমাদের রব চান।

নিজ বাচ্চাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিন। মাদরাসায় ভর্তি করুন। আমি কিভাবে বুঝাব যে, আজ মুসলমানদের দ্বীনী ইলম দ্বারা লালিত পালিত হওয়ার ইয়াকীন নেই। আল্লাহ তা'আলা যিনি সকলের প্রতিপালক তাঁর ইলম দ্বারা লালিত পালিত হওয়ার ইয়াকীন মানুষের নেই। অন্যান্য ফুনুন (জ্ঞান) দ্বারা লালিত পালিত হওয়ার ইয়াকীন আছে। হাদীছে এসেছে যে কুরআন পড়ে ধনী না হয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা কুরআনতো অবশ্যই ধনী বানাবে।

আমার সম্মানিত বন্ধুরা! ইলম দুই প্রকার (১) ফাযায়েলের ইলম (২) মাসায়িলের ইলম। ফাযায়েলের ইলম তালীমে বসে অর্জন করবেন। এবং মাসায়িলের ইলম উলামাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। পদে পদে জিজ্ঞাসা করে চলুন যে, আমি বিবাহ কিভাবে করব? ব্যবসা কিভাবে করব? আমি অমুক চাকুরী করি হালাল না হারাম? জায়েয না নাজায়েয?

হারাম খাবারের প্রতিক্রিয়া

যদি এমন না করেন তবে অমুসলিমরা হারামের এত রাস্তা খুলে দিয়েছে যে, তারা কোন ভাবেই মুসলমানদেরকে হালাল খাওয়ার সুযোগ দিতে আগ্রহী নয়। তারা জানে যে, তাদের খাবার হারাম করে দাও অন্যথায় তাদের বদ দুআ আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। হ্যাঁ যদি তাদের খাবার হারাম হয়ে যায় তাহলে তাদের বদ দুআ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তাদের খাবার হারাম এবং জীবীকা উপার্জনের পছা হারাম হয়ে যায় তখন তারাই নিজ দু'আর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। এবং আমাদেরও কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তখন তারা তাদের দুআ এবং বদ দুআ দ্বারা কোন আশা করতে পারবে না। কেননা হারাম আহারকারীর দুআ আল্লাহর নিকট গৃহিত হয় না।

এই জন্য আমার সাথীরা! উলামাদেরকে খুব মুহাব্বত করুন। উলামাদের সাক্ষাতকে ইবাদত বিশ্বাস করুন।

পদে পদে তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা ফরজ। উলামাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে চলা প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব। উলামাদের নিকট প্রত্যেক জিনিস জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করুন।

মাওলানা ইলিয়াস রাহঃ বলতেন-“আল্লাহর খেয়াল ছাড়া জিকির করা বিদ'আত।” কোন কোন আলেমের মতে আল্লাহ তা'আলার খেয়াল ছাড়া জিকির করা হারাম। আল্লাহর খেয়াল ছাড়া জিকির করলে শরীরে অলসতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলার খেয়াল ছাড়া জিকির করা আল্লাহ তা'আলাকে অপদস্থ করার শামিল। এখনতো দেখা যায় যে কেউ হাতে তাসবীহ নিয়ে বসলে তার ঘুম আসতে থাকে। অথচ জিকির হল নিজের ভিতরের অমনযোগিতা দূর করার জন্য। কিন্তু দেখা যায় অমনযোগিতার সাথেই জিকির করা হয়। হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন- যখন জিকির কর তখন যবানকে অন্তরের অধীনস্থ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলার জিকির দ্বারা আল্লাহর খেয়াল সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য।

আমার সাথীরা! যবান নড়া-চড়া করা অথবা তাসবীহর দানা গণনা করা মূল কাজ নয়। বরং মূল কাজ আল্লাহর খেয়াল। যবানতো অন্তরের ভাষ্যকার। লক্ষ্য করুন! যদি কোন ব্যক্তি ডাক্তারের নিকট যায় তখন যবান দ্বারা নিজের অবস্থা বর্ণনা করে। এই যবানই নিজ ভিতরের কথা যবান দ্বারা ব্যক্ত করে। এই জন্য আমার সাথীরা! আল্লাহ তা'আলার

খোরালের সাথে জিকির করার মশক করুন। জিকিরের জন্য ওয়ু করুন।
লোকেরা আপনাকে বলবে ওয়ু ছাড়াও জিকির হয়ে যায়। না, আমি যা
বলছি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমি আপনাদের নিকট হযরতের সব
কথা নকল করছি। হযরত বলতেন- “জিকিরের জন্য ওয়ু করুন, নির্জনতা
তাল্লাশ করুন এবং আল্লাহর জিকির নির্জনে করুন। আল্লাহর জিকির
গাইরুল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে স্মরণ করুন। এটাকে জিকির বলে। তাই
নির্জনতা খোঁজ করুন। তৃতীয় কালিমা, দরুদ শরীফ, এস্তেগফার এই তিন
ভাসবীহ সকাল বিকাল আল্লাহ তা'আলার ধ্যানের সাথে আদায় করুন।”

আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার দ্রুততম পথ

আরেকটি কথা শ্রবণ করুন। আল্লাহ তা'আলা তাউফীক দান করলে
সুবহে সাদিকের পূর্বে কমপক্ষে তিনটি আয়াত হলেও দেখে পড়ে নিন।
মাওলানা ইলিয়াস রহঃ বলতেন- আমি সমস্ত বুয়ুর্গদেরকে জিকির ওজিফা
করতে দেখেছি। কিন্তু সুবহে সাদিকের পূর্বে কুরআন দেখে পড়ার
মাধ্যমে যত দ্রুত আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা যায়, অন্য কোন
অজিফা জিকির এবং কোন আমলের মধ্যে অনুভব করি নাই। লম্বা লম্বা
জিকির করাতো এখন মানুষের অভ্যাস হয়ে গেছে। অথচ হুজুর
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতকে সংক্ষিপ্ত এবং পরিমিত
জিকির করতে বলেছেন। আমাদের অনেক সাথীরা জামা'আতে বের হয়ে
অসুস্থ হয়ে ফিরে আসে। এর কারণ হল- কয়েক সপ্তাহ ঘুমায় না, তাই
দেমাগ শুষ্ক হয়ে যায় এবং মাতালের মত কথা বলে। এভাবে আল্লাহর
রাস্তা থেকে অসুস্থ হয়ে ফিরে আসে। লোকেরা যদি তাকে জিজ্ঞাসা করে
আপনি কি পড়েছেন! তখন জানা যায় যে, জামা'আতে বের হয়ে কোন
কিতাবে কোন বুয়ুর্গের ওজিফা পড়েছে। অথবা কারো থেকে কোন
বুয়ুর্গের ওজিফা শুনে নিজ থেকেই আমল করা শুরু করেছে। বন্ধুরা
আমার এটা কত বড় আশ্চর্য কথা যে, সুন্নতের আমলের মধ্যে সে ঐ
বুয়ুর্গী দেখতে পায় না, যা একজন বুয়ুর্গের অনুকরণ করার মধ্যে অনুভব
করে। কেউ বলে আমি এতগুলো জিকির আদায় করেছি, কেউ বলে
আমি অমুক অজিফা এতবার পড়েছি, এটা সাথীদের অভ্যাস হয়ে গেছে।
অথচ যে জিনিস, যে জিকির, যে অজিফা, যে আমল হুজুর (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত তা ছাড়া যদি কোন জিকির বা

আমল সারা জীবন ও পালন করা হয়, তাহলে তার দ্বারা সওয়াব পাওয়া যাবে না এবং হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ বলে গণ্য হবে না। একবার কিছু সাহাবী পরস্পরে আলোচনা করলেনঃ-

আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগে পরে সকল গোনাহ মাফ হয়ে গেছে এবং তিনি আল্লাহর পছন্দনীয়। আল্লাহ তা'আলাতো তাঁকে এমনই সম্মানে ভূষিত করবেন। আমরা তো কুফর থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাদের জন্য এই আমল একেবারেই স্বল্প। সুতরাং সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিল-

একজন বললেন- আমি সর্বদা রোজা রাখব, রোজা ভঙ্গ করব না।
একজন বললেন- আমি সারা রাত জাগ্রত থাকব ঘুমাব না।

একজন বললেন- আমি বিবাহ করব না। যেন ইবাদতের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় পাই। কারণ বিবি থাকবে না, বাচ্চা ও থাকবে না। হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একথা শুনে খুবই রাগান্বিত হলেন। তাদের সকলকে একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন-

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।
লোকেরা এই হাদীছ পড়ে কিছ্র অধিকাংশেরই জানা নেই যে, مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي এ কথা হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখন বলেছিলেন? হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একথা তখন বলেছিলেন যখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সুন্নত থেকে বিচ্যুত হতে দেখেছেন। কেননা তাঁরা আরো বেশী আমল করার ইচ্ছা করেছেন। আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন? আমি আপনাদেরকে বলছি- আপনারা সকলেই মসনূন দু'আর ইহতেমাম করুন। মাসনূন দু'আর কিতাব কিনে নিন। এবং এই সমস্ত দু'আ পড়ুন।

হযরত বলতেন- মসনূন দু'আই আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার আশা রয়েছে। সুতরাং আমার আবেদন এটাই যে, আপনারা ঐসব জিকিরের এহতেমাম করুন যা হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত। একবার হযরত জুয়াইরিয়া অনেক বীচি জমা করে বসে পড়ছিলেন। হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে প্রবেশ করে দেখেন তিনি বীচি পড়ছেন এবং বীচির স্তূপ হয়ে গেছে। হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন- কি করছ? উত্তর দিলেন-

আল্লাহর জিকির করছি। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- আমি তোমার এখানে এসে এমন কিছু কালিমা বলেছি, যদি এই কালিমা গুলোর ওজন করা হয় তাহলে এ বীচির কোন ওজনই হবে না এই কয়েকটি কালিমার মুকাবেলায়। জি-হ্যা? মসনুন জিকিরের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার সকল ওয়াদা রয়েছে।

আমার সাথীরা! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ মধ্যম পছার রাস্তা। এটা করা যাবে না যে, আমি ঐ কাজ করছি যা অমুক বুয়ুর্গ করেন। আমি ঐ জিকির করি যা অমুক বুয়ুর্গ করেন। জিকিরের মধ্যেও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করুন। এক মজলিসে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একশতবার এস্তেগফার করেছেন। অতঃপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- তোমরা ও এস্তেগফার কর। কেননা মসনুন জিকিরের মধ্যে মধ্যম পছা রয়েছে। সাথীরা এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে না। হ্যা সংক্ষিপ্ত ওজীফাই সুন্নত ওজীফা। আমাদেরকে এভাবেই আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে জিকিরের এহতেমাম করতে হবে। অযুর সহিত খুব খেয়ালের সাথে জিকির করতে হবে।

আমার ভায়েরা! দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর জাতের সাথে যদি সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আমাদের এবং বান্দাদের মধ্যকার অবস্থা ঠিক করে দিবেন। যে নিজ এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার অবস্থা ঠিক করে নিবে, তো আল্লাহ তা'আলা তার এবং বান্দাদের মধ্যকার অবস্থা ঠিক করে দিবেন। আল্লাহর সাথে মু'আমালা ঠিক করার অর্থ হল দু'আর মাধ্যমে নিজের সকল সমস্যার সমাধান করা। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারবে না, সে বান্দার হক নষ্ট করবে। কেননা বান্দার হক ঐ ব্যক্তি নষ্ট করে, যে আল্লাহর হক নষ্ট করে। আর দু'আ আল্লাহ তা'আলার হক। যে আল্লাহর হকের প্রতি ভ্রক্ষেপ করে না সে বান্দাদের হকের কি ভ্রক্ষেপ করবে?

এই জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে ইকরামুল মুসলিমীন শিখতে হবে। ইকরামের মশক হয় খেদমতের দ্বারা। তাই আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় বের হয়ে বেশী বেশী খেদমত করতে হবে। সুতরাং খেদমত নিজের তরবিরের জন্য। প্রত্যেকে খেদমতের মুখাপেক্ষি যেমনিভাবে

প্রত্যেকে তরবীয়তের মুখাপেক্ষি। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নিজেকে খেদমতের জন্য পেশ করুন। বলুন- খাবার আমি তৈরি করব। লাকড়ি আমি জ্বালাব, জঙ্গল থেকে আমি লাকড়ি বেছে আনব। যদি হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জঙ্গল থেকে লাকড়ি বেছে আনতে পারেন তাহলে আপনার আমার কি সম্মানের চিন্তা!

একবারের ঘটনা, সাহাবায়ে কেরাম নিম্নোক্ত কাজগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন। বকরী কে কাটবে, গোশত কে বানাবে, খাবার কে রান্না করবে। হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- আমি কি কাজ করব? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আপনি আল্লাহ তা'আলার নবী। তখন হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- আমি জঙ্গল থেকে লাকড়ি বেছে নিয়ে আসব।

অতঃপর হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং জঙ্গল থেকে নিজে লাকড়ি বহন করে নিয়ে আসলেন। হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামের সাথে খেদমতে এমনভাবে নিয়োজিত থাকতেন যে, বহিরাগতদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হত **ایکم محمد** তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে?

কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকত না যে, তিনি আমীর। বরং আমীর সাহেবতো খেদমতে সবার আগে থাকতেন।

এই জন্য আমার সাথীরা! খেদমত করা নিজের তরবীয়তের জন্য। এটাতো সম্ভবই না যে, কেউ মানুষ হবে এবং খেদমতের মাধ্যমে তার তরবীয়ত হবে না। ঈমানদার হবে এবং তার মধ্যে বিনয় থাকবে না। এই জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে আমাদেরকে খুব মশক করতে হবে। নিজের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করার জন্য খেদমতে খুব অংশগ্রহণ করবেন। লক্ষ্য রাখবেন এই কাজগুলো যেন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হয়। এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য আমাদের থাকতে পারে না। কাজগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্যই হবে। কেননা হাদীছ শরীফে এসেছে- সামান্যতম রিয়াও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। গাইরুল্লাহর সামান্য খেয়ালও শিরক। সুতরাং এই কাজ গুলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই হবে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকা যাবে না। এক সাহাবী এসে আরজ করলেন- হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি ঐ ব্যক্তির

সম্পর্কে কি বলেন- যে কোন নিক আমল করে এবং মনে মনে কামনা করে কেউ তাকে দেখে নিক। হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- সে কিছুই পাবে না। জি হ্যাঁ। এক সাহাবী এসে আরজ করলেন- হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেউ নেক আমল করে এবং সে এটার মধ্যে আনন্দ পায় যে কেউ তাঁর আমল দেখুক। আপনি তার সম্পর্কে কি বলেন? হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুপ থাকলেন। তাঁর উপর আয়াত অবতীর্ণ হল- যে ব্যক্তি নিজ আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে মিলতে চায় তাঁর উচিত নিজ আমল একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা। আল্লাহর ইবাদতের সাথে অন্য কাউকে শরীক করার অর্থ হল, বান্দা নিজ আমল দ্বারা গাইরুল্লাহকে সম্বলিত করতে চায়।

আমার সাথীরা! লক্ষ্য করুন, এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখান থেকে আপনি জামাতের সাথে বের হবেন। সেখানে গিয়ে যখন আপনি তাহাজ্জুদ পড়বেন তখন মনে এই খেয়াল সৃষ্টি হবে যে, যদি আমীর সাহেব দেখে নিতেন। আমি তাহাজ্জুদ পড়ছি আর সকলে ঘুমাচ্ছে। গাশতে গিয়ে যদি আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কোন ভাল কথা বলার তৌফিক দান করেন তখন মসজিদে এসে আগ্রহ সৃষ্টি হবে যে, যদি কেউ আমার কথা আমীর সাহেবের নিকট বলে দিতেন। আমীর সাহেব! উনি গাশতের মধ্যে অনেক ভাল কথা বলেছেন। হযরত বলতেন এটা একেবারেই শিরক। দুনিয়াতে তাকে অনেক ভাল জায়গা দিবেন কিন্তু আখেরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। শয়তান ভিতরে এই কুমন্ত্রনা দিবে আপনি গাশতে খুব সুন্দর কথা বলেছেন। যদি আমীর সাহেব জানতে পারেন তাহলে আপনাকেই মুতাকাল্লিম বানাবেন। এমন ব্যক্তির সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকবে না।

আমার সাথীরা! যেভাবে আমাদেরকে মূর্তির শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হয় অনুরূপভাবে আমাদেরকে আমলের শিরক থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। কেননা একটি মূর্তির শিরক অপরটি আমলের শিরক। মূর্তির শিরক হল গাইরুল্লাহর ইবাদত করা। আমলের শিরক হল গাইরুল্লাহর জন্য আমল করা। উভয় প্রকার শিরক জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এই জন্য আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে দু'আ করুন হে আল্লাহ! আমাদের আমলে এখলাস সৃষ্টি করে দিন। আমাদের আমলকে

একেবারেই আপনার জন্য করে নিন। নতুবা শয়তান পদে পদে নিয়তের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করবে। নিয়তকে নষ্ট করার চেষ্টা করবে। এভাবে আমাদের আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে ছয় সফাতের মশক করতে হবে। আমরা আল্লাহর রাস্তায় এই জন্য বের হচ্ছি যেন এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের অন্তরে ভালভাবে বসে যায় এবং দ্বীনের উপর চলার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়।

এই জন্য আমার সাথীরা! আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য সর্ব প্রথম যে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে তা হল অন্তরের মধ্যে এই কাজের আজমত সৃষ্টি করতে হবে। এই আজমত সাহাবায়ে কেরামের আজমত সদৃশ হতে হবে।

এই কাজের প্রতি এমনই গুরুত্বারোপ করতে হবে যেমন সাহাবায়ে কেরাম করেছেন। কেননা এটা সেই কাজ যা সাহাবায়ে কেরাম করেছেন। একথা অন্তর দিয়ে ভালভাবে ইয়াকীন করে নিন যে, আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল এক বিকাল দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা অপেক্ষা উত্তম। আমাদের যদি এই খেয়াল হয় যে, দুনিয়াতে তো ভাল কাজ আরো অনেক আছে, সুতরাং কি প্রয়োজন যে তাবলীগেই বের হতে হবে? শুনুন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা যখন নিজ জামাতের সাথে না গিয়ে পিছনে রয়ে গেলেন তখন কি জন্য রয়ে গেলেন?

দোকানের জন্য?

ভাইয়ের বিবাহের জন্য?

ব্যবসার জন্য?

বিবি-বাচ্চার প্রয়োজনের জন্য? তাদের অসুস্থতার জন্য? না, হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে জুম'আ পড়ার জন্য, তাঁর খুতবা শুনার জন্য, হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মসজিদের ফজিলত অর্জন করার জন্য। কারণ মসজিদে নববীর ফজীলত সমস্ত মসজিদ অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। শুধু এই ফযীলত অর্জন করার জন্য রয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) এর খেয়াল হল যে, জামা'আত তো সকালে রওয়ানা হয়ে গেছে আমি জুম'আর নামায পড়ে চলে যাব। আমার কথা খুব ভালভাবে শুনুন। হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহকে দেখে বললেন- "তুমি রওয়ানা হও নি?" তিনি আরজ করলেন হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

আমার এই খেয়াল হল যে, আমি আপনার পিছনে নামায পড়ার ফযীলত, আপনার খুতবা শুনার ফযীলত, আপনার মসজিদের ফযীলত অর্জন করব। অতঃপর জামা'আতে গিয়ে অংশগ্রহণ করব। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- হে আব্দুল্লাহ! যদি তুমি দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ কোন ভাল কাজে ব্যয় করে দাও তবুও সকালে বিদায়ী জামা'আতের ফযীলত অর্জন করতে পারবে না। লক্ষ্য করুন, আমার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যদি আমাদের এই ধারণা হয় যে, দুনিয়াতে ভাল কাজ আরো অনেক রয়েছে সুতরাং জামা'আতে বের হওয়া কি জরুরী? হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে উত্তর দিয়ে এ বিষয়টি পরিস্কার করে দিয়েছেন। আল্লাহর রাস্তার আমল অন্য কোন আমলের সাথে তুলনা হয় না। শবে কদরে, হাজরে আসওয়াদ এবং মুলতায়ামের সামনে কেউ সারা রাত ইবাদত করে আর অন্য কেউ কিছু সময়ের জন্য আল্লাহর রাস্তায় থাকে তবে তার ফযীলত, তার স্তর, তার মাকাম, তার সওয়াব আল্লাহর নিকট অনেক বেশী।

এখানে সকলেই মাশাআল্লাহ পুরাতন সাথী। আপনাদের নিকট আরজ করছি- এই ফযীলত গুলো হাদীছে দেখে বার বার বর্ণনা করুন। অন্যথায় সাথীদের ভিতর থেকে এবং উম্মতের ভিতর থেকে এই রাস্তায় বের হওয়ার ফযীলত শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর এই কাজ সাংগঠনিক হয়ে যাবে। এই কাজ কোন সাংগঠনিক কাজ নয়। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যে ফযীলত পেয়েছেন আমরাও সেই ফযীলত পাব। মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) বারবার বলতেন- কাজতো ঐটাই যা নবীদের কাজ ছিল। কাজতো ঐটাই যা সাহাবায়ে কেরামের কাজ ছিল। এই জন্য সাহাবায়ে কেরামের আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার ফযীলত খুব বর্ণনা করুন। আমি আপনাদের নিকট কিভাবে আরজ করব? আমাদের থেকে সবচেয়ে বড় ভুল এটা প্রকাশ পেয়েছে যে, আমরা সাহাবায়ে কেরামের আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়াকে শুধু কিতালের উপর প্রয়োগ করে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। অথচ এটা জিহাদের ফযীলত। হত্যাতো একটি আকস্মিক ব্যাপার।

অনেক গায়ওয়া এমনও ছিল যেখান থেকে সাহাবায়ে কেরাম কিতাল ছাড়া এমনিই ফিরেছেন। কেননা হেদায়েত উদ্দেশ্য। ধ্বংসযজ্ঞ চালানো

উদ্দেশ্য নয়। সাহাবায়ে কেরামের আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার যত ফযীলত বর্ণিত আছে তা সবই এই রাস্তায় বের হওয়ার।

আমার সাথীরা! একবার সাহাবায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁরা শুধু ছয় মাসের ছুটি নিবেন। এসময় নিজস্ব ব্যবসা বাণিজ্য দেখবেন, বিবি-বাচ্চাদের খোঁজ খবর নিবেন, ঘর-বাড়ী ঠিক করবেন, অনাবাদ জমি আবাদ করবেন। তখন হজুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- “তোমরা এই নিয়ত করেছ। আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ” নিজেকে নিজে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেয়ো না। যদি তোমরা ছয় মাসের জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

হযরত (রহঃ) বলতেন- সাহাবায়ে কেরাম ছয় মাসের জন্য মদীনায় অবস্থান করে বাড়ীর কাজ-কর্ম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা’আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন এবং বললেন- নিজেকে নিজে ধ্বংস করো না। তারপর যখন পরবর্তী লোকেরা এই আয়াতের ব্যবহার একাজ ছাড়া অন্য কাজে প্রয়োগ করলেন তখন আবু আইয়ুব (রা.) বললেন- “তোমরা ভুল বলছ।” এই আয়াত আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একবার আমরা আনসারা ছয় মাস মদীনায় অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হায়! আমরা সাহাবায়ে কেরামের কাজের স্তর নির্ণয় করতে পারি নাই। এই জন্য তাঁদের কাজকে আমাদের কাজ থেকে স্বল্প মনে করি।

হায়াতুস সাহাবা খুব পড়ুন

এই জন্য আমার সাথী ভাইয়েরা! হায়াতুস সাহাবা খুব পড়ুন। কোন শব্দ গুয়ারী যেন এমন না থাকে যেখানে হায়াতুস সাহাবা পড়া না হয়। তবে শর্ত হল সাল লাগানো আলেম থাকতে হবে। ব্যাপকভাবে আমি সবাই কে বলছি- আপনারা যারা জামা’আতে বের হচ্ছেন অথবা জামা’আত থেকে ফিরে আসছেন, সকলেই এই সিদ্ধান্ত করে নিন যে, হায়াতুস সাহাবা আমরা ব্যক্তিগত ভাবে পড়ব। তখন আমরা কমপক্ষে এটা অনুধাবন করতে পারব যে, আমরা কি করছি এবং সাহাবায়ে কেরাম কি করেছেন। যদি আমরা অনুরূপ কাজ না করি তাহলে আমাদের রাস্তা ভিন্ন হবে এবং তাঁদের রাস্তা ভিন্ন হবে।

জি-হ্যা, আমার প্রিয় সাথীরা! এই রাস্তায় বের হওয়ার সেই ফযীলত যা সাহাবায়ে কেরামের জন্য ছিল। এই রাস্তায় এক সকাল এক বিকাল দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। আল্লাহর রাস্তায় অর্ধ দিন পাঁচশত বছর সমতুল্য। আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় অবস্থানকারীদের জন্য ঐ ফযীলত রয়েছে যা সাহাবায়ে কেরামের জন্য ছিল। আল্লাহর রাস্তায় পায়ে হেটে চলা আল্লাহ তা'আলার রাগকে ঠান্ডাকারী সবচেয়ে বড় আমল। কেননা এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলার রাগের সবচেয়ে বড় বহিঃপ্রকাশ হল জাহান্নাম। আর একথা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'আলার রাস্তার ধূলা বালি এবং জাহান্নাম কখনো জমা হতে পারে না। যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় জগ্মত থাকে, পাহারা দেয় এমন চোখ কোন দিন জাহান্নামের আগুন দেখবে না।

এই জন্য আমার সাথীরা! হায়!! আমি কিভাবে আরজ করব- এখানে আমরা যারা উপবিষ্ট তাদের মধ্যে যারা এখন জামা'আতে বের হচ্ছেন না, তারা হয়ত ভাবছেন, ভাই জামা'আতে যেতে হবে ঠিক। কিন্তু এখন আমার সুযোগ নেই। হায়, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা অর্ধ দিন পিছনে থাকায় হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- তুমি পাঁচশত বছর পিছনে থেকে গেলে। এখন যারা জামা'আতে বের হচ্ছেন না তারা বসে খুব চিন্তা করুন। তারা হয়ত অনুধাবন করতে পারছেন না যে, এই কাজ কত দ্রুত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার মাধ্যম।

মাওলানা ইলিয়াস (রা.) বলতেন- “দ্রুত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার জন্য এর চেয়ে উত্তম কোন আমল নেই। যতটুকু সম্ভব পায়ে হেটে চলুন। যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছেন, এবং যারা এখন বের হচ্ছেন না, বাড়ী ফিরে যাচ্ছেন এবং আশপাশের এলাকা থেকে এসেছেন সবার নিকট আমার আবেদন। এখান থেকে আপনারা পায়দল কাজ করতে করতে যান।

তালীমের কাজ,
গাশতের কাজ,
নামাযের কাজ,
জিকিরের কাজ,
তिलाওয়াতের কাজ,

ঘরে ঘরে গিয়ে সাফাত করার কাজ,
দাওয়াতের কাজ।

পরিবেশ তৈরী করতে করতে যান। যত লোক এখান থেকে আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছেন, এই প্রদেশে অথবা এই প্রদেশের বাহিরে, যদি এখান থেকে দুনিয়ার কথা বলতে বলতে যান, তাহলে ঐ সমস্ত নূর নষ্ট করে প্রত্যাবর্তন করবেন, যা এই তিন দিনে অর্জন হয়েছে। পরস্পরে ঐ কথা বলতে বলতে যান, যা এখানে আরজ করা হয়েছে। আমল করতে করতে যান। যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছেন তারা নিজ জামা'আতের সাথে জমে জমে চলবেন। আমীরকে মেনে চলবেন। ট্রেনে, বাসে বা যে গাড়ীতেই সফর করেন না কেন প্রত্যেককে দাওয়াত দিবেন। প্রত্যেকের সাথে সাফাত করবেন। এদিকে লক্ষ্য করবেন না যে, আমাদের জামা'আতের লোক কি না?

সবচেয়ে বড় দাওয়াত এবং হেকমত "ইকরাম"

আমার প্রিয় সাথীরা! প্রত্যেককে সালাম করুন। প্রত্যেককে দাওয়াত দিন। কেননা হাদীছে ইরশাদ হচ্ছে শুধু পরিচিত হওয়ার কারণে সালাম করা কিয়ামতের আলামত। সকাল বিকাল কত মুসলমানের সাথে সাফাত হয়, কেউ সালামের এহতেমাম করে না। এজন্য প্রত্যেককে সালাম করুন। প্রত্যেককে দাওয়াত দিন। আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিন। লক্ষ্য করুন সবচেয়ে বড় দাওয়াত ও হেকমত হচ্ছে "ইকরাম"। আপনারা ট্রেনে বসে থাকুন অথবা বাসে বসে থাকুন আমীর সাহেব বলবেন- দশজন লোকের জামা'আত। দশ কাপ চা নিয়ে আসুন। তওবা তওবা এটা বখীলের জামা'আত। হযরত বলতেন- আপনাদের চলাফেরা ইসলাম প্রচারের জন্য। ইসলাম ইকরামের মাধ্যমে প্রচার লাভ করেছে। খুব খরচ করুন। তাশকীলকারীরা আপনাদেরকে বলবে- হ্যাঁ আপনাদের রুখ অমুক এলাকায় দিয়েছি। এখান থেকে আপনাদের জামা'আত অমুক জায়গায় যাবে। খরচের জন্য পাঁচশত টাকা যথেষ্ট। না, বরং তাদেরকে বলুন- আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছি। টাকা বেশী নিয়ে যাব। সবার ইকরাম করব। খাওয়াব পান করাব। হযরত বলতেন- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে খরচ করে লোকদেরকে ইসলামের দিকে উৎসাহিত করেছেন। বকরি ভর্তি

একটি উপত্যকা একজন মুশরিককে দিয়ে দিয়েছেন। সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুধু বকরীগুলিকে দেখছিল। অতঃপর সেখানেই সে মুসলমান হয়ে গেল। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যের বিষয় হল মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে অন্তরে মালের প্রতি ঘৃণা চলে আসত। অতঃপর উক্ত মাল সে নিজে না রেখে অন্যের জন্য খরচ করে ফেলত।

এই জন্যই আমি বলছিলাম যে, আল্লাহর রাস্তায় মন খুলে খরচ করুন। অন্যর জন্য খরচ করা এটাও একটা আমল। আল্লাহর রাস্তায় খুব খরচ করুন, আমার সাহেবকে বলুন আপনি সকলের জন্য চা বিস্কুট আনেন টাকা আমি দিচ্ছি। বাসে, ট্রেনে অনেক অমুসলিমের সাথে দেখা হবে তাদেরও একরাম করুন। তাদের সাথে হাসি মুখে কথা বলুন। আর নিজেদের মধ্যে আল্লাহর বড়ত্বের কথা বেশি বেশি আলোচনা করতে থাকুন। এতে তারাও আল্লাহর কথা শুনবে, আল্লাহর সাথে পরিচিত হবে।

দেখুন ভায়েরা! কথা একেবারে পরিস্কার। আমরা তো আল্লাহর দিকে ডাকছি, আমাদের এই ডাকা বিশেষ কোন গোষ্ঠি, বিশেষ কোন দল, বিশেষ কোন মতাদর্শ কিংবা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের দিকে নয়। তাবলীগ জামা'আতে আসার জন্য দাওয়াত দেয়াও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা তো ডাকব আল্লাহর দিকে। এটাই উম্মত হওয়ার রাস্তা। তোমরাও এই উম্মতের সদস্য হয়ে দাওয়াত দাও। হযরত জী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলতেন, জামাআত শব্দটাই পার্থক্য সৃষ্টিকারী। আমরা যদি লোকদেরকে বলি আমাদের জামাআতে আসুন তাহলে একথার দ্বারা আমরা একটা প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়ে দিলাম। আমরা একটা জামাআত হয়ে গেলাম। জামাআত থেকে জামাআত হয়, দল থেকে দল হয়, উম্মতের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে জামাআত থেকে জামাআত বানানো। বরং আমরা তো আল্লাহর দিকে ডাকছি, এভাবে প্রত্যেককেই দাওয়াত দিতে হবে। ট্রেনে, বাসে যাদেরকে পাওয়া যায় তাদেরকেও দাওয়াত দিতে হবে। তাদের সাথে মূল্যাকাত করতে হবে। যাকে দাওয়াত দেয়া হবে তাকেও দাঈ বানিয়ে ছাড়তে হবে। তাকে বলতে হবে, দেখুন ভাই! আপনার সাথে আমাদের কথা হল, মাশাআল্লাহ আপনি এরা দা করলেন। এখন আপনিও অন্যের নিকট এই কথা পৌঁছে দেবেন। এভাবে যার সাথে কথা বলবেন তাকে দাঈ বানাবেন।

এভাবে আমাদেরকে দাওয়াত দিতে থাকতে হবে। ইবাদত করতে থাকতে হবে। ট্রেনে সফর অবস্থায় তালীমের হালকা কার্যে মকরার দরকার নেই। কেননা তালীমের হালকার জন্য একমাত্র দরকান। ট্রেনে সাথিরা বিভিন্ন জায়গায় বসে থাকে, সেখানে তালীম জারী রাখা মুশকিল।

তালীমের জন্য প্রত্যেকের সাথে নিজস্ব কিতাব থাকতে হবে, জামাআতে যদি দশজন সাথি থাকে তাহলে দশটা কিতাব থাকতে হবে, এমন না হয় যে, পুরা জামাআতে একটা মাত্র কিতাব। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কিতাব কিনে নেবে। ট্রেনে-বাসে কেউ পাশে এসে বসলে তার নাম জিজ্ঞাসা করুন। তার সাথে পরিচিত হোন, যদি সে মুসলমান হয় তাহলে বলুন ভাই আমার কাছে একটা কিতাব আছে, আমি তো এখনও পড়ি নাই আপনি যদি একটু পড়ে শোনাতেন। ব্যস এভাবে তালীম হয়ে গেল, দাওয়াত হয়ে গেল। কেউ হয়ত পড়ে বলবে সুবহানাল্লাহ! এত দামি কথা আগে তো আমি শুনি নাই। নামায ছাড়লে এরকম মারাত্মক গোনাহ, নামায পড়লে এত নেকী এতো আমি জানতামই না। এভাবে বাসে ট্রেনে প্রত্যেকের কাছে নিজস্ব কিতাব থাকতে হবে।

গন্তব্য স্থলে পৌঁছে জামাআত কি করবে?

গন্তব্য স্থলে নামার পরে সাথিরা সামান্য পত্র ভাল করে চেক করে যার যারটা নিজেই বহন করতে হবে। সাথিদেরকে দেখে নিতে হবে সকলে আছে কিনা, অতঃপর মহল্লায় প্রবেশের আগে দুআ করে নেবে। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত দুআ আছে যেগুলি মুখস্থ করে নিতে পারলে ভাল। দুআর মধ্যে মহল্লাবাসীদের মহক্বত এবং সেখানকার কল্যাণ কামনা করে দুআ করবে। আশ্বিয়ায়ে কেরাম উভয় মহক্বত আল্লাহর নিকট থেকে চেয়ে নিতেন। হে আল্লাহ! তাদের মহক্বত আমাদের অন্তরে এবং আমাদের মহক্বত তাদের অন্তরে ঢেলে দাও। কেননা মহক্বত পয়দা না হলে তো তারা কথাই শুনবে না।

সর্ব প্রথম জামাআত মসজিদে হাজির হবে। মসজিদে পৌঁছার আগেই কেনাকাটা শুরু করবে না। এমন যেন না হয় যে, বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছি চলো বাজার করেই নিয়ে যাই। কেননা সর্ব প্রথম কদম যার উপর রাখা হবে সেটাই উদ্দেশ্য হয়ে গেল। এই জন্য সর্ব প্রথম মসজিদে প্রবেশ করে মাল সামান্য একদিকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখ। পুরা

মসজিদে যেন সামান্য পত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থাকে। স্টোভ কিংবা কোন দুর্গন্ধযুক্ত জিনিষ মসজিদে রাখবে না। রসুন, পিয়াজ ইত্যাদি খেয়ে মসজিদে যেও না, হাদীছে এটাকে শক্ত ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। মসজিদের আদব এহতেরাম বজায় রাখতে হবে। মাকরুহ সময় না হলে মসজিদে প্রবেশ করার দূরাকাআত তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ে নাও। মসজিদে প্রবেশ করার পরে আল্লাহর ঘরে অবস্থান করার মত মুড় বানিয়ে নাও। অতঃপর সকলেই মাশওয়ারায় বসে যাও। স্থানীয় সাথি যদি মাশওয়ারায় থাকে তাহলে খুব ভাল। না থাকলে তাদের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। মাশওয়ারার মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টার নেয়াম বানিয়ে ফেলতে হবে। মাকামী সাথিদের থেকে এলাকার কাজের অবস্থা, পুরাতন সাথিদের সংখ্যা জেনে নিতে হবে। ঘরে ঘরে যেয়ে যেন গাশত করা যায় তার নেয়াম বানাতে হবে। বিভিন্ন তবকার লোকদের কাছে যেতে হবে। মালদারের মাল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দাওয়াত দিলে সে তোমার কথায় মোটেও প্রভাবিত হবে না। তার দুনিয়াদারীর যতটা প্রভাব তোমার অন্তরে পড়বে তোমার স্বীনের কথা সে ততটা তাচ্ছিল্যের সাথে শুনবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা যতটা তোমার অন্তরে বদ্ধমূল হবে যে ততটা মহব্বতের সাথে তোমার কথা শ্রবণ করবে। তবে ডাইরেক্ট সমালোচনা করা যাবে না। ঘৃণাটা দিলের ভেতরেই থাকবে, মুখে যেন না আসে। এভাবে প্রত্যেকের সাথে আমাদেরকে মূল্যাকাত করতে হবে। উমুমি গাশতে প্রত্যেকের কাছে যেতে হবে। নগদ নগদ মসজিদের পরিবেশে নিয়ে আসতে হবে। মসজিদে এনে তাদেরকে তৈরী করতে হবে, চার চার মাসের জন্য তাশকীল করতে হবে, যারা তৈরী হয়ে যায় তাদেরকে উসুল করতে হবে। ছেড়ে দিলে হবে না। তাহলে হাত ছাড়া হয়ে যাবে, উসুলের জন্য উসুলী গাশত করতে হবে, এভাবে মোট পাঁচ প্রকারের গাশত আমাদেরকে করতে হবে। তালীমী গাশত, উমুমী গাশত, খুসুসী গাশত, তাশকীলী গাশত এবং উসুলী গাশত।

মসজিদের পরিবেশে আনাটাই মূল উদ্দেশ্য

দেখুন আমি শুরুতেই বলেছি যে, মসজিদের পরিবেশে আনাটাই মূল উদ্দেশ্য, এমনভাবে দাওয়াত দিতে হবে যেন প্রত্যেক জায়গা থেকে আল্লাহর রাস্তায় নগদ জামাআত বের হয়। যেখান থেকে তিন চিল্লার জামাআত তৈরী হবে সেখানকার মাকামী সাথিদের সাথে পরামর্শ করে

জামাআতের যিম্মাদার বানিয়ে দিতে হবে। যে কোন মসজিদে পাঁচ কাজ চালু না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে জামাআত নড়বে না। দেখুন আমার কথা খুব ভালভাবে নোট করুন। জামাআতগুলি শুধু এলাকা সার্ভে করে চলে আসে, এভাবে মসজিদে মসজিদে ঘোরা উদ্দেশ্য নয়। মসজিদে কাজ চালু করা উদ্দেশ্য। এভাবে কাজ চালু হলে এলাকার পরিবেশ বদলে যাবে। আমলের মধ্যে পরিবর্তন আসবে। যেখানে দেখবেন আমল জিন্দা হয়নি সেখান থেকে আগে বাড়বেন না। এজন্য একই এলাকায় যদি চার মাস কাটাতে হয় থাকবেন। আমার খেয়াল হল, এক মসজিদ থেকে জামাআতের অন্য মসজিদে যাওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক না যতক্ষণ সেখানে কাজের নকশা সামনে না আসে। এভাবে মেহনত করলে ইনশাআল্লাহ সেখান থেকে নগদ জামাআত বের হবে।

এই মজলিসে আমরা যত মানুষ একত্রিত হয়েছি সকলে পাক্কা এরাদা করে যাই যে, ইনশাআল্লাহ এই কাজকে আমরা মাকসাদ বানিয়ে চলব। সকলে পাক্কা এরাদা করে যাই যে, কোন অবস্থায় নামায ছাড়ব না। মুসলমানদের থেকে এই ওয়াদা নেয়া যে, নামায ছাড়ব না বড় আফসোসের কথা। কেননা, নামায ছেড়ে দেয়া কুফরী। আর মুসলমান কখনো কুফরীর মধ্যে লিপ্ত হতে পারে না। মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে, সুদ খেতে পারে, জুয়া খেলতে পারে কিন্তু নামায ছেড়ে দেবে এটা তো কল্পনাও করা যায় না। আগের যুগে মুসলমানকে তার নামায দ্বারাই চেনা যেত। আর আমাদের যুগে নাম শুনে বা খতনার আলামত দেখে চিনতে হয়, বড়ই লজ্জার কথা। এখন দুআ হবে। সকলে আল্লাহ তাআলার দিকে মুতাওজ্জাহ হয়ে যাই। আন্তাহিয়াতুর সুরতে বসি সকলে।

মসজিদ আবাদের মেহনত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ঈমানকে শক্তিশালী করার উপায় চারটি

কুদরত

وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ

مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ: আল্লাহ তাআলাকে তাঁর ওইসকল বান্দাগণই ভয় করে যাদের নিকট তাঁর কুদরতের ইলম রয়েছে।

(ফাতির:২৮)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ

غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَاسَمْعُونَ . قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ

أَفَلَا تَبْصُرُونَ

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ: হে নবী! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে, আচ্ছা বলো তো, যদি আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের উপর রাতকে দীর্ঘায়িত করেন তাহলে আল্লাহ ভিন্ন এমন কোন মাবুদ আছে যে তোমাদের জন্য আলো আনয়ন করবে? তোমরা কি শোন না? আপনি তাদেরকে আরো জিজ্ঞাসা করুন যে, আচ্ছা বলো তো! যদি আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের উপর দিনকে দীর্ঘায়িত করেন তাহলে তিনি ভিন্ন এমন কোন মাবুদ আছে যে তোমাদের জন্য রাত আনয়ন করবে? যেন তোমরা তাতে আরাম করতে পার। তবুও কি তোমরা লক্ষ্য কর না!!

(কাসাস: ৭১-৭২)

চার জিনিসের সমষ্টিকে কুদরত বলেঃ

১. যখন চান-

২. যেখানে চান-

৩. যেমন চান-

৪. যা চান- তা-ই করতে পারেন।

যার মধ্যে এই চার গুণ থাকবে তাকেই কুদরতওয়ালা বলা যেতে পারে। এই বিষয়গুলো চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এগুলো কেবল মাত্র আল্লাহ তাআলার সত্ত্বার সাথেই সম্পৃক্ত। এ জন্য সর্ব প্রথম আমাদের এ বিষয়টিকেই বুঝতে হবে যে,

১. কুদরত ওয়ালা কে?

২. কার মধ্যে এই চার সিক্ত বিদ্যমান?

৩. কে সবকিছু করতে সক্ষম?

৪. কে এমনটি করে দেখিয়েছেন এবং কে-ই বা এমনটি করতে পারেন?

তো চিন্তা করলে এটাই জানা যাবে যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সত্ত্বাই সবকিছু করতে সক্ষম। বিষয়টি নিম্নে বর্ণিত ঘটনাবলী হতে পরিষ্কার হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তাআলা- মা-বাবা ছাড়া আদম আ. কে সৃষ্টি করেছেন। মায়ের পেট ছাড়া হাওয়া আ. কে সৃষ্টি করেছেন। যমীন ছাড়া সাত যমীন বানিয়েছেন। সূর্য ছাড়া সূর্য এবং চন্দ্র ছাড়া চন্দ্র বানিয়েছেন। তারা ছাড়া তারা বানিয়েছেন।

এমনিভাবে এই পৃথিবীতে প্রথমবার তিনি ডিম ছাড়া পাখি বানিয়েছেন। কোন জীব-জন্তু ছাড়াই তিনি জীব-জন্তু বানিয়েছেন। আমাদেরকে তাঁর পরিচয় দেয়ার জন্য এখন তিনি জানোয়ারের পেটে জানোয়ার এবং ডিমের ভিতর পাখি বানিয়ে দেখাচ্ছেন। ঈমান না শিখার কারণে আজ আমাদের বিশ্বাস হল, যে জিনিস থেকে যা বের হয় তা ওই জিনিস থেকেই তৈরী হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, কোন মাখলূকের কোন কিছু বানানোর কুদরত নেই।

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ: মানুষ আল্লাহ ব্যতীত যে সব জিনিসের উপাসনা করে, তা সব মিলেও কোন কিছু বানাতে পারে না। বরং তাদের সবাইকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। (নাহল)

قُلْ مَنْ يَدِينُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجْزِيهِ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
تَيَقُّنُونَ اللَّهُ قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ: হে নবী! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে, এমন কে আছে যার হাতে সব কিছুর ক্ষমতা ও ইচ্ছার রয়েছে যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার উপর আশ্রয়দাতা নেই? যদি তোমরা জান (তাহলে বল)। তারা বলবে আল্লাহই, বলুন, তবুও তোমরা কেমন করে (গাইরুল্লাহর) মোহগস্ত হচ্ছে। (মমিনুন: ৮৮-৮৯)

এ বিষয়টি বুঝানোর জন্যেই কুরআনে বিভিন্ন ঘটনা এসেছে।

-হযরত সালেহ আ. এর কওমের জন্য পাহাড় হতে উটনী বের করে দিয়েছেন।

-হযরত মুসা আ. এর হাতের আগুল হতে দুধ ও ওষুধ বের করেছেন।

-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত ঈসা আ. এর জন্য আকাশ হতে পাত্রসহ খানা নামিয়ে দিয়েছেন।

-কুমারী মেয়ে হযরত মারইয়াম আ. এর পেটে হযরত ঈসা আ. কে সৃষ্টি করেছেন।

-বনী ইসরাঈলকে ৪০ বছর পর্যন্ত আকাশ হতে মান্না সালওয়া খাইয়েছেন।

উম্মে আইমান রা. এর জন্য আকাশ হতে পানিভর্তি বালতি নামিয়ে দিয়েছেন।

হযরত খুবাইব রা. এর জন্য বদ্ধ ঘরে আকাশ থেকে আগুরের থোকা নামিয়ে দিয়েছেন।

যেমনভাবে হযরত মারইয়ামের রা. জন্যও আকাশ হতে ফল নামাতেন।

বন্ধুগণ! এই সমস্ত নেয়াম আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতেই চালিয়েছেন। আর এই কুদরত একমাত্র তাঁর সত্ত্বায়ই রয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোন শেকেলে নেই। চাই উক্ত শেকেল

পিপড়ার হোক বা জিব্রাইল আ. এর

যমীনের হোক বা আকাশের

অণুর হোক বা পাহাড়ের

ফোটার হোক বা সমুদ্রের

অর্থাৎ আরশ থেকে ফরশ (যমীন) এর মধ্যকার কোন শেকেলে আল্লাহর কুদরত নেই। তাঁর কুদরত শুধুমাত্র তাঁর সত্তায়ই। এই সমস্ত শেকেল তাঁর কুদরতেই হয়েছে, তবে কোন শেকেলরই কোন কিছু বানানো বা কোন কিছু করার কুদরত নেই।

সূর্যের মধ্যে আলো বানানোর কুদরত নেই। অন্যথায় কিয়ামতের দিন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে কেন?

ক্ষেতের মধ্যে শস্য ও সবজী বানানোর কুদরত নেই অন্যথায় যমীন অনাবাদযোগ্য পড়ে থাকে কেন?

গাছের মধ্যে ফল দেয়ার কুদরত নেই, অন্যথায় সব সময় ফল দেয় না কেন?

মেঘের মধ্যে বৃষ্টি দেয়ার কুদরত নেই, অন্যথায় প্রত্যেক মেঘ হতে বৃষ্টি হয় না কেন?

জানোয়ার ও মায়েদের দুধ দেয়ার কুদরত নেই, অন্যথায় প্রত্যেক জানোয়ার ও মহিলা সর্বদা দুধ দেয় না কেন?

মৌমাছির মধ্যে মধু বানানোর কুদরত নেই, অন্যথায় সব চাক হতেই সর্বদা মধু বের হত।

পাহাড়ের মধ্যে স্বর্ণ রূপা বানানোর কুদরত নেই, অন্যথায় সব পাহাড় হতেই সোনা-রূপা বের হত।

যমীনের মধ্যে কয়লা, সীসা, তামা, পিতল, লোহা, পেট্রল, গ্যাস ও পানি বানানোর কুদরত নেই। অন্যথায় সব জায়গায় যমীন হতে এগুলো বের হত।

এসব যা কিছুই এই শেকেলগুলো থেকে বের হচ্ছে, যেমন:

জানোয়ারের শেকেল হতে দুধ,

বৃক্ষলতার শেকেল হতে শস্য ও সবজী,

মৌমাছির চাকের শেকেল হতে মধু,

মেঘের শেকেল হতে পানি এবং

সূর্যের শেকেল হতে আলো ইত্যাদি

এই সবকিছু আসমানে বিদ্যমান, আল্লাহ তাআলার গায়েবী ভান্ডার হতে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এইসব শেকেলগুলোতে পাঠানো হচ্ছে। আমরা আসতে দেখিনা, কিন্তু বের হতে দেখি। নিম্নের আয়াতে কুরআনী ও হাদীস থেকে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হচ্ছে।

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلِ
مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ

“আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু।
আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমাদের বাক-স্বপ্নটির
মতই এই সব সত্য।” (যাবিয়াত: ২২-২৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ
مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ

“হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ
ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদিগকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী
হতে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সুতরাং কোথায়
তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছে? (ফাতির: ৩)

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

“আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি উহা
পরিমিত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।” (হিজর: ২১)

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ لَكُمْ
الْمُزْنُ لَوْ لَا نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

“তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ?
তোমরা কি উহা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি উহা বর্ষণ করি? আমি
ইচ্ছা করলে উহা লবনাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?” (ওয়াকিআ: ৬৮-৭০)

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ

خَضِرًا

“তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা আমি
সর্ব প্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্গম করি; অনন্তর উহা হতে সবুজ পাতা
উদ্গত করি।”

(আন'আম: ৯৯)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ

“শপথ বহুপথ বিশিষ্ট আকাশের”

(যারিয়াত: ৭)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যুবাইর রা. কে বলেন, হে যুবাইর! আল্লাহ তাআলা আরশে অধিষ্ঠিত হয়ে বান্দাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দেন এবং বলেন, বান্দাগণ! তোমরা হলে আমার মাখলুক আর আমিই তোমাদের সব প্রয়োজন পূরাকারী প্রভু। তোমাদের রিযিক আমার কজায়। সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে এমন মেহনতে জড়াইও না যার দায়িত্ব আমি নিয়ে নিয়েছি। তোমরা আমার নিকট রিযিক কামনা কর; কেননা সন্ত আকাশের উপরে রিযিকের দরজা খোলা রয়েছে। আরশের ভান্ডারের সাথে তা মিলিত। রাতেও তার দরজা বন্ধ হয় না, দিনেও না। এই দরজা দিয়ে আল্লাহ তাআলা সকলের রিযিক নামাতে থাকেন। লোকদের ধারণা তাদের দান, তাদের সদকা ও তাদের খরচ মোতাবেক তিনি রিযিক পৌছান। যে কম খরচ করে তার জন্য কম আর যে বেশী খরচ করে তার জন্য বেশী পরিমাণে নাযিল করা হয়।

(দুররে মানজুর)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন; মানুষের নিকট তার রুখী পৌছানোর জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে, যারা আপাদমস্তক ইসলামে রয়েছে আসমান যমীন হতে তাদের রিযিক পৌছে দাও, আর অন্যদের রিযিকও পৌছে দাও। তবে অন্যরা তাদের নির্ধারিত রিযিক হতে বেশী পেতে পারে না।

(আবু আওয়ানা)

হযরত ইবনে আক্বাস রা. হতে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: আল্লাহ তাআলা বৃষ্টির সময় বৃষ্টির ফোটার চেয়ে বেশী ফেরেশতা অবতরণ করেন। তারা বৃষ্টির প্রতিটি ফোটা গণনা করেন যে, তা কোথায় পড়বে এবং তা দ্বারা উৎপন্ন ফল কার রিযিক হবে।

(আবু শায়খ: ৪৯৩)

হযরত আলী রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা পানির ভান্ডারের উপর একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাঁর হাতে একটি নিক্তি রয়েছে। যমীনে আগত বৃষ্টির প্রতি ফোটা ওই নিক্তি অতিক্রম করেই আসে। তবে হযরত নূহ আ. এর তুফানের দিন এমন হয়নি। সেদিন আল্লাহ তাআলা সরাসরি পানিকেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেদিন

ফেরেশতাগণের পানিকে আটকে রাখার সুযোগ হয়নি। (কানযুল উম্মাল-
২৭৩)

হযরত ইবনে আক্বাস রা. বলেন, একবার মেঘমালা দ্বারা আমরা ছায়াপ্রাপ্ত হই। আমরা ভেবেছিলাম যে, বৃষ্টি হবে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মেঘমালায় নিয়োজিত ফেরেশতা এইমাত্র এসে সালাম করে বললেন যে, তিনি "ইয়ামান উপত্যকায়" এই মেঘ নিয়ে যাচ্ছেন। ওখানে 'যুরআ' নামক স্থানে তার পানি বর্ষিত হবে।

(আবু আওয়না)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, প্রত্যেক আসমানে প্রতিটি মানুষের জন্য দুটি করে দরজা রয়েছে। একটি দিয়ে তার আমল উপরে যায়। আর অপরটি দিয়ে তার রিযিক নিচে নামে।

(কিতাবুল জানায়েয)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা মানুষের নিকট তাদের রিযিক পৌঁছানোর জন্য ফেরেশতা নির্ধারণ করে রেখেছেন।

- (ইবনে আবী শাইবা)

এই হাদীস দ্বারা বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যখন মালাকুল মউত কোন ঈমানদারের জান কবজা করার জন্য পাঁচশত ফেরেশতা নিয়ে আসেন তখন তাদের হাতে রাইহান ফুলের তোড়া থাকে, তার প্রতি শাখায় বিশ বিশ রঙের ফুল থাকে। প্রতি ফুলে নতুন নতুন স্রাব হয়। তার সাথে মেশকমিশ্রিত সাদা রঙের একটি রুমালও থাকে। সেটা মৃত ব্যক্তির থুতনীর নিচে ধরা হয়। সাথে জান্নাতী কাফনও থাকে।

তো এতকিছু মৃত ব্যক্তি ছাড়া পাশে উপবিষ্ট কেউ দেখতে পায় না, এখন এই জিনিসগুলোই যদি পৃথিবীতে ছড়ানো ছিটানো বিভিন্ন শেকেল হতে আসতো তাহলে সবার নয়রে পড়ত। কিন্তু এই জিনিসগুলো নিয়ে আসমান হতে আগত ফেরেশতাগণ মানুষের নয়রে আসে না। (তাই বলে কি এমনটা হয় না?)

তেমনিভাবে হযরত হানযালা রা. কে যখন ফেরেশতাগণ গোসল দেন তখন তাদের আনা পানি কেউ দেখেনি। কিন্তু ওই পানি যখন তার

শরীরে ঢালা হয় তখন তাঁর শরীরের পশমের গোড়া হতে পানি পড়তে সাহায্যে কেরাম (রা.) দেখেছেন।

তাই মুহতারাম বন্ধুগণ! কোন শেকেলের মধ্যে কোন কিছু বানানোর শক্তি নেই। পৃথিবীতে ছড়ানো বিভিন্ন শেকেল হতে নানা রকম জিনিস বের করে আল্লাহ তাআলা আমাদের পরীক্ষা ও তার পরিচয় দিতে চান। আমরা যেন বুঝতে পারি যে, মাখলূকের কোন কুদরত নেই, দেনেওয়ালা যাত একমাত্র এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই।

জানোয়ার হতে দুধ

ক্ষেত হতে ফসল

গাছ হতে ফল

মৌমাছি হতে মধু

সূর্য্য হতে আলো

মেঘ হতে বৃষ্টি

এইসব শেকেল হতে বের হওয়া জিনিসগুলো আসমানে রক্ষিত আল্লাহ তাআলার ভান্ডার হতে পাঠানো হয়। যেমন নাকি টেলিভিশন, মোবাইল ইন্টারনেট ইত্যাদি হতে আমরা কখনো খবর, কখনো হকি বা ক্রিকেটের ম্যাচ বা অন্যান্য প্রোগ্রাম বের হতে দেখি। তবে এই দেখা জিনিসগুলো ওইগুলোর মধ্যে তৈরী হয় না, বরং ওইগুলোর মারকায ও কেন্দ্র (ষ্টুডিও) হতে এই প্রোগ্রামগুলো পাঠানো হয়। কিন্তু কোন মানুষ এই প্রোগ্রামগুলো বাতাসে ভেসে আসতে দেখে না। (তাই বলে কি এইগুলো কেন্দ্র হতে আসে না?)

দেখুন! আপনি আপনার মোবাইল কিংবা ইন্টারনেট হতে কাউকে মেসেজ বা ই-মেইল পাঠালেন। আপনি যার নিকট পাঠালেন তার মোবাইল বা ইন্টারনেট তালাশ করে তাতে ঢুকে পড়ে। চাই সে আপনার নিকট হতে হাজার কি.মি. দূর হোক না কেন। সেকেন্ডের মধ্যে সেখানে পৌঁছে যায়। এবং আপনি যে মেসেজ বা ই-মেইলে ছবি ইত্যাদি পাঠালেন তাতে কত ছবি পাঠানো হয়। তারপরও যার কাছে যেটা পাঠানো হয় সে সেটাই পায়। আমাদের রিষিকের বিষয়টি এমনই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মানুষ মজবুত দুর্গ বা চুনার পাহাড়ে আবদ্ধ হয়ে গেলেও তার নিকট দুটি

জিনিস পৌছবেই পৌছবে। ১. তার রিয়িক ২. মালাকুল মউত্ত। অর্থাৎ কোন মানুষ নিজেকে লোহার সিন্দুক ভরে ভিতর দিয়ে তালা লাগিয়ে দিলেও তার রুখী ও রুহ কবজাকারী ফেরেশতা তার নিকট পৌছবেই। যেমনিভাবে ডিমের খোসার ভিতর রঙ-বেরঙের ডানা, রক্ত, গোশত এবং প্রাণ পৌছে যায়।

বন্ধুগণ! আল্লাহ তাআলা এই যাহেরী নেয়াম ও সু ব্যবস্থাপনা দ্বারা আমাদেরকে তাঁর গায়েবী নেয়াম বুঝাতে চাচ্ছেন। স্বীয় শক্তি ও কুদরত বুঝাতে চাচ্ছেন। তা হলো এই যে, প্রত্যেক মাখলূকের রিয়িক আকাশ হতে পৌছানো দেখিনা। তিনি যাহেরী নেয়াম বানিয়েছেন ইমতিহানের জন্য আর গায়েবী নেয়াম বানিয়েছেন ইতমিনানের (নিশ্চিততার) জন্য। কিন্তু যে গায়েবের ইয়াকীন হাসেল করতে পারবে, সে-ই গায়েব দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।

যে নিজের মধ্যে গায়েবের ইয়াকীন বানিয়ে নিতে পারবে, ফেরেশতাদের দ্বারা পরিচালিত গায়েবী নেয়াম তার অনুগত হয়ে যাবে। এই গায়েবী নেয়াম কি ভাবে কারো অনুগত হয় তা হাদীসের আলোকে বুঝে নেয়া দরকার।

হযরত আবু উমামা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মুমিনের সাথে তিনশত ষাট জন ফেরেশতা থাকেন। যে সব বিপদ আপদ তার উপর আসার নয় তারা তা তার নিকট হতে দূর করতে থাকেন।

গুধুমাত্র চোখের জন্য সাতজন ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। তারা তার উপর হতে এমনিভাবে বিপদ আপদ দূর করতে থাকেন, যেমনি ভাবে গরমকালে মধু হতে মাছি দৌড়ানো হয়। ওই সব ফেরেশতাগণকে তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়া হলে তোমরা তাদেরকে মাঠে প্রান্তরে খালি চোখে দেখতে পাবে।

-তাবরানী

যেখানে সাধারণ লোকজনের সাথে দশজন ফেরেশতা থাকেন, সেখানে মহিলাদের সাথে এগার জন থাকেন।

হযরত উসমান গণি রা. বলেন, আমি একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রত্যেক লোকের সাথে কতজন ফেরেশতা থাকেন? তিনি বলেন, একজন

ফেরেশতা তোমার ডানে থাকেন যিনি তোমার নেক কাজের ব্যাপারে আদিষ্ট। অপরজন তোমার বামে, যিনি তোমার গোনাহ লিখেন, ডানের ফেরেশতা বামের ফেরেশতার সরদার।

দুই ফেরেশতা তোমার আগে-পিছে, তারা বিপদ আপদ হতে হেফায়ত করেন, এক ফেরেশতা তোমার কপাল ধরে আছেন। কেউ বিনয় অবলম্বন করলে তার মাথা উচু করে দেন। আর অহংকার করলে নিচু করে দেন।

দুই ফেরেশতা আছেন তোমার ঠোঁটের উপর। দরুদ ও সালাম পড়লে তারা তা পৌঁছে দেন।

এক ফেরেশতা আছেন তোমার মুখের উপর। যারা মুখে পোকা-মাকড় ঢুকতে দেয় না। আর দুই ফেরেশতা আছেন তোমার চোখের উপর।

-ইবনে জারীর

নিম্নে লিখিত হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন যে, কি ভাবে ফেরেশতাদের দ্বারা পরিচালিত গায়েবী নেয়াম মুমিনের সাহায্যে এসে যায়।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা বেশী বেশী মসজিদে অবস্থান করে তারা হল মসজিদের খুটা। তাদের সাথে ফেরেশতাগণও বসে থাকেন। তারা কোন কারণে মসজিদে না গেলে ফেরেশতাগণ তাদেরকে তালাশ করেন। অসুস্থ হলে ফেরেশতাগণ তাদের সেবা শুশ্রূষা করেন। তারা নিজের কোন প্রয়োজনে বাহিরে গেলে ফেরেশতাগণ তাদের সাহায্য করেন।

-মুসনাদে আহমদ

হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জুমআর দিন ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়ান, তারপর মসজিদে আগত লোকদের নাম লিখেন। তারপর খুৎবা আরম্ভ হলে নাম লেখা বন্ধ করে দিয়ে খুৎবা শোনতে লাগেন। - বুখারী

হযরত সালমান ফারসী রা. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোন মুসলমান জঙ্গলে ইকামাত দিয়ে নামায আদায় করে তখন উভয় ফেরেশতা তার সাথে নামায আদায় করে। আর যদি কোন মুসলমান কোন বন-জঙ্গল বা মাঠে-প্রান্তরে আযান-ইকামত দিয়ে নামায আরম্ভ করে তখন তার পেছনে এত

সংখ্যক ফেরেশতা নামায আদায় করেন যে, তাদের কাতারের কোন প্রান্তর দেখা যায় না। -মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাক

আনসারী সাহাবী হযরত আউস রা. হতে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঈদের দিন সকালে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে পৃথিবীর শহরে বন্দরে পাঠিয়ে দেন। তারা যমীনে অবতরণ করে বিভিন্ন রাস্তা ও অলি গলীতে দাঁড়িয়ে আওয়ায করে বলতে থাকেন, ওই রক্বে কারীম এর দরবারে চল যিনি অধিক অনুগ্রহ করেন। অতঃপর, লোকজন ঈদগাহে যেতে লাগে। -তাবারানী

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে মুসলমান বিছানায় গিয়ে কুরআনের কোন সূরা পড়ে নেয় তখন আল্লাহ তাআলা তার হেফাজতের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। যিনি তার জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত তার হেফাজতে থাকেন। -তিরমিযী

হযরত মা'কেল ইবনে ইয়াসার রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন; যে মুসলমান উযু করে শয়ন করে একজন ফেরেশতা তার গা ঘেঁষে রাত যাপন করেন। রাতে যখন সে জাগ্রত হয় তখন সে ফেরেশতা তাকে এই বলে দুআ দেন যে, আল্লাহ! আপনি এই বান্দাকে মাফ করে দিন, কেননা সে উযুসহ শুয়ে ছিল। -ইবনে হিব্বান

হযরত আলী রা. কর্তৃক বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন; যাদের কাছে কুকুর বা ঘণ্টা থাকে তাদের নিকট রহমতের ফেরেশতা অবস্থান করেন না। - মুসলিম শরীফ

হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: দুশমনদের সাথে মুকাবেলা করার সময় ফেরেশতাগণ ঘোড়া দৌড় ও তীর নিক্ষেপে তোমাদের সাথে থাকেন। -তাবারানী

হযরত আয়েশা রা. বলেন, ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে হাজী সওয়ারী যোগে হজ্ব করে ফেরেশতা তার সাথে মুসাফাহা করেন। আর যে পায়দল হজ্ব করে তার সাথে মুআনাকা করেন। -বায়হাকী

হযরত ইবনে উমর রা. বলেন, ফেরেশতাগণ জুমার দিন পাগড়ী বেঁধে নামাযে উপস্থিত হন। আর সূর্য ডুবা পর্যন্ত পাগড়ী ওয়ালাগণকে সালাম করতে থাকেন। - তারীখে ইবনে আসাকীর

বঙ্গুগণ দেখুন! এক হল গাইবের ইলম হওয়া আর এক হল গাইবের ইয়াকীন হওয়া, ইলম হলো কিতাব দেখে বা কারো নিকট শোনে গাইবের ইলম হওয়া। আর ইয়াকীন হল, তা শিখে নিজের ভিতরে পয়দা করা। তাইতো হযরতে সাহাবা (রা.) বলতেন, আমরা আগে ঈমান শিখেছি তারপর কুরআন শিখেছি। অর্থাৎ আমরা প্রথমত: দিলের মধ্যে গাইবের ইয়াকীন জমিয়েছি।

হযরত আবু বকর রা. বাইতুল খালাতে (বাথরুম) যাওয়ার আগে চাদর বিছিয়ে বলতেন, হে মুহাফেয ফেরেশতাগণ! আপনারা এই চাদরে তাশরীফ রাখুন। কেননা আমি আল্লাহ তাআলার সাথে এই অঙ্গিকার করেছি যে, বাইতুল খালাতে কোন কথা বলব না। -মুকাদ্দমায়ে আবুল-লাইছ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, গোনাহ করার সময় কিছু বিষয় এমন হয় যা গোনার চেয়েও জঘন্য। তা হল, গোনাহ করার সময় ডানে বামের ফেরেশতা হতে লজ্জা না করা, তা গোনাহর চেয়েও মারাত্মক গোনাহ।

-কানযুল উম্মাল

গায়েব- এর ইয়াকীন

(১) এক হল (أَمَنَ بِاللَّهِ) ঈমান বিল্লাহ। অর্থাৎ এই বাস্তবতাকে পুরাপুরী বিশ্বাস করা যে, সবকিছু আল্লাহ তাআলার যাত হতে হয়। আল্লাহ ব্যতীত কারো দ্বারা কিছু হয় না। তাই একমাত্র তাঁকেই রাযী করার ফিকির করতে হবে এবং তাঁর জন্যই জীবন-মরণ।

(২) দ্বিতীয় হল (والیوم الآخر) ঈমান বিল ইয়াওমিল আখের। অর্থাৎ এই হাকীকতকে পুরাপুরী ইয়াকীন করা যে, এই জীবন আসল জীবন নয়। বরং এই জীবন পুরা হওয়ার পর অপর এক জীবন ও ভিন্ন এক জগত রয়েছে। আসল জীবন সেটাই। এই কিছু দিনের জীবন শুধুমাত্র আসল জীবনের তৈয়ারীর জন্যই। আর মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতা সেই স্থায়ী জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার উপরই নির্ভরশীল।

(৩) তৃতীয় হল (وملائكته) ঈমান বিল মালা-ইকা। অর্থাৎ এই বিষয়টি ইয়াকীন করা যে, এই বিশ্ব যে সব বাহ্যিক উপকরণ দ্বারা পরিচালিত বলে নয়রে আসে, আসলে এই সব উপকরণ ও আসবাব দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেনা বরং আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণের বাতেনী নেয়াম দ্বারা যাহেরী নেয়াম পরিচালিত করছেন। যেমন, আমরা দেখি, বৃষ্টি হয় মেঘ ও বাতাস হতে। এবং বৃষ্টির পানিতে যমীনের ফসল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।

এখন ফেরেশতাগণের উপর ঈমান আনার মতলব হল এই যে, আমরা যেন এই কথার দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের মাধ্যমে এই সব কাজ করছেন। কেমন যেন এই যাহেরী আসবাবের পেছনে ফেরেশতাগণের না দেখা নেয়াম রয়েছে। আর তার পেছনে আল্লাহ তাআলার যাত, তাঁর হুকুম ও তাঁর ইচ্ছা।

(৪) চতুর্থ হল (وكتبه ورسله) ঈমান বিন কিতাব ওয়ান্-নাবিয়্যীন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পাঠানো কিতাব ও নবীগণের ব্যাপারে এই বিশ্বাস করা যে, আমল ইলম ও খবর উহাই যা আল্লাহ তাআলার কিতাবে আছে এবং নবীগণের মাধ্যমে মানুষ প্রাপ্ত হয়েছে। এতদভিন্ন যা কিছু আছে তা অবাস্তব ও অসম্পূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ মানুষেরও কামিয়াবীর রাস্তা সেটাই যা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীগণ বলেছেন। এখন যদি সারা বিশ্বের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী ও লিডাররা তার বিপরীত বলে ও ফিকির করে তাহলে তা শুধু ভুলই নয়; বরং অজ্ঞতার উপর অজ্ঞতা।

হযরতজী ইউসুফ রহ. বলতেন, সমস্ত হুকুম এসেছে পরে, সর্বপ্রথম হুকুম হল, আল্লাহ তাআলার যাতের উপর ইয়াকীন কায়েম করা। এটা হল ঈমানের গোড়া ও শিকড়। কারণ, তার সত্তা তো গাইব বা অদৃশ্য। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত কেউ আল্লাহ তাআলার সত্তা দেখেনি। স্বয়ং জিব্রাইল আ. ও দেখেনি। তিনি বলেন, আমার ও আল্লাহ তাআলার মাঝে সত্তারটি পর্দার বাধা আছে। তন্মধ্য হতে একটি পর্দা সরিয়ে দিলেও আমি তাঁর তাজাল্লীতে জ্বলে ছাই হয়ে যাব।

পরিশেষে কেউ যেন তাঁর সত্তার অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে অস্বীকার করে না বসে। কেননা তখনতো কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না তখন মানুষের মাঝে এক বিশেষ প্রশ্ন থেকে যেত যে,

তাহলে আল্লাহর অস্তিত্ব আছে কি নাই? ব্যাস, এই প্রশ্ন খতম করার জন্যই আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীবকে আরশে ডেকে নিয়ে দীদার করিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর যাত হক ও সত্য। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁর বান্দাদেরকে এই দাওয়াত দিয়েছেন যে, তারা যেন তাঁর প্রতি ঈমান আনে তাহলে তিনি তাদেরকে নিজ তত্ত্বাবধান ও হেফযতে নিয়ে নিবেন। - হাইছামী

বন্ধুগণ! যে যাত সর্বদা ছিলেন ও সদা থাকবেন তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বপ্রথম যে হুকুম নাযেল করেছেন তা হল, اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ। তথা আল্লাহ তাআলার যাতে ইয়াকীন যেন দিলের মধ্যে বসানো হয়। প্রশ্ন হল, কিভাবে তাঁর যাতে ইয়াকীন পয়দা হবে ও দিলে বসবে? তো আল্লাহর যাতে ইয়াকীন তখনই পয়দা হবে যখন আমরা আমাদের নিজের যাতে ব্যাপারে চিন্তা ফিকির করবো।

হযরত আলী রা. বলেন, কেউ নিজেকে না চিনলে আল্লাহ তাআলা কেও চিনবে না যে-

- (১) আমরা পাঁচশত বছর পূর্বে কোথায় ছিলাম?
- (২) আমরা এই দুনিয়ায় কোথেকে এলাম?
- (৩) আমাদের শরীর বানালেন কে?
- (৪) কি ভাবে বানিয়েছেন?

(৫) একশ বছর পর আমরা কোথায় থাকবো? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর জন্য কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে আমাদের নিজেদেরকে চিনতে হবে যে, আমাদেরকে কে বানিয়েছেন? কেন বানালেন? কোথায় বানালেন? এবং কিভাবে বানালেন?

মানুষের সৃষ্টি

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ
أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ نَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَذَا غَافِلِينَ

স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ

করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলে, হ্যাঁ অবশ্যই আমরা সাক্ষী রইলাম। ইহা এ জন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম।

(আ'রাফ- ১৭২)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন আদম আ. এর পৃষ্ঠদেশ হতে মানুষের রূহ বের করেন এবং তাদেরকে একত্রিত করেন, জোড়া জোড়া বানান, আকুর-আকৃতি গঠন করেন, বলার শক্তি দেন, তারপর সবার নিকট প্রশ্ন করলেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই? তখন সবাই জবাব দিয়েছিল যে, হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের রব। তারপর এই স্বীকৃতির উপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী বানান। যেন কিয়ামতের দিন কেউ না বলে যে, আমাদের তো কোন খবর ছিল না।

হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে- আল্লাহ তা'আলা বলেন, ইয়াকীন করো আমি ছাড়া কোন মা'বুদ ও রব নেই। তাই আমার রব্বিয়াতের ব্যাপারে কোন জিনিসকে শরীক করবে না। আমি তোমাদের নিকট নবী-রাসূল পাঠাতেই থাকবো যারা তোমাদেরকে এই ওয়াদা-অঙ্গিকারের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিবেন। তারপর আবার কিতাবও পাঠাবো। তখন সবাই রব বলে স্বীকার করে নেয়।

(মুসনাদে আহমদ)

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. إِنَّا

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَيِّئًا بَصِيرًا

“কালপ্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এই জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।

(দাহর:১-২)

বন্ধুগণ! আল্লাহ তা'আলা কাউকে ইমতিহানের জন্য এই পৃথিবীতে পাঠানোর ইচ্ছা করলে এক বিশেষ তরীকায় তার মায়ের পেটে তার শরীর বানাতে শুরু করেন।

مِّنْ آتَى شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ

فَأَقْبَرَهُ

“তিনি উহাকে কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন? অকৃনিম্ব হতে, তিনি উহাকে সৃষ্টি করেছেন। পরে উহার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন। অতঃপর উহার জন্য পথ সহজ করে দেন। তৎপর উহার মৃত্যু ঘটান এবং উহাকে কবরস্থ করেন।”

(আবাসা-১৮-২১)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।” (তীন:৪)

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

“আমি মৃত্যু হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, উহাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং উহা হতেই পুনর্বীর তোমাদেরকে বের করব।

(তা-হা:৫৫)

আল্লাহ তা’আলা যে মাটি হতে মানুষের শরীর বানান, যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত সে মাটিরই অণু-পরমাণু ছড়ানো থাকে। আল্লাহ তা’আলা নিজ কুদরতে সেগুলো একত্রিত করে খাবারের সাথে মার পেটে পৌছে দেন। তারপর তা রক্তে, তারপর বীর্যে পরিণত করেন। অতঃপর উক্ত নুতফা (বীর্য ফোটা) মায়ের পেটের বাচ্চাদানীতে পৌছে দেন।

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يُخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ

وَالْتَرَائِبِ

“সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কী হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে! তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে ঝলিত পানি হতে, ইহা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে।”

(তারিক:৫-৭)

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

“তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে! উহা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?”

(ওয়াকিয়া:৫৮-৫৬)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নুতফা চল্লিশ দিন পর্যন্ত রেহেমে নিজ অবস্থায়ই থাকে। চল্লিশ দিন পুরা হলে, রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। তেমনিভাবে চল্লিশ দিন পর গোশতের টুকরায় পরিণত হয়। তারপর

তার মধ্যে হাড় সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করেন।
(মুসনাদে আহমদ)

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ

“আমি কি তার জন্য দুই চক্ষু সৃষ্টি করিনি? আর জিহবা ও দুই ওষ্ঠ?”

(বালাদ:৮-৯)

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

“প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে।”

(তারিক:৪)

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা মেয়েলোকের বাচ্চাদানীতে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন, যিনি বাচ্চাটির গঠনের বিভিন্ন স্তর আল্লাহ তা'আলার নিকট বলতে থাকেন যে,

আয় আল্লাহ! এখন ইহা শুক্রবিন্দু

আয় আল্লাহ! এখন ইহা রক্তপিণ্ড

আয় আল্লাহ! এখন ইহা গোশতের টুকরা

তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা ওই বাচ্চাকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ! তার ব্যাপারে কি লিখব? ছেলে না মেয়ে? হতভাগা না ভাগ্যবান? রিয়িক কি পরিমাণ হবে? বয়স কত হবে?

(বুখারী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মেয়েলোকের বাচ্চাদানীতে নিযুক্ত ফেরেশতার কাজ হল এই যে, যখন বাচ্চার মা শোয় বা ঘুমায় তখন এই ফেরেশতা বাচ্চার মাথা উপরে উঠিয়ে দেন। তিনি এমন না করলে বাচ্চা রক্তে ডুবে যাবে।

(আবুশ শায়খ)

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: কন্যাশিশু জন্ম নিলে আল্লাহ তা'আলা তার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠান, যিনি তার উপর অনেক বরকত অবতরণ করান এবং বলেন, তুমি হলে দুর্বল। কারণ, দুর্বল হতেই তোমার জন্ম। যে উক্ত কন্যাসন্তানের দায়িত্বভার গ্রহণ করে কিয়ামত পর্যন্ত তার সাহায্য করা হয়। আর পুত্র সন্তান জন্ম নিলেও আল্লাহ তা'আলা তার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠান, যিনি তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝে চুম্বন করেন এবং বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সালাম বলেছেন।

(তাবারানী)

বন্ধুগণ! নুত্ফা যখন বাচ্চাদানীতে পৌছে যায় তখন রেহেমের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। যেমনি ভাবে বেলুনের মধ্যে কোন জিনিস ঢেলে তারপর বাতাস ভরে তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। তবে বাচ্চাদানী বা রেহেমে শুধু নুত্ফা ঢালা হয়, বাতাস ভরা হয় না। যখনই বাচ্চার শরীর বেড়ে উঠে বাচ্চাদানী বেলুনের মত ফুলতে থাকে। যার কারণে মায়ের পেট ফোলে বড় হয়ে যায়। চল্লিশ দিন পর সাদা রঙ্গের নুত্ফা লাল রঙ্গের জমাট রক্তে পরিণত হয়।

যেমনি ভাবে ফেরআউনীদের পান করার পানিকে রক্তে পরিণত করে দিয়েছিলেন।

তারপর চল্লিশ দিন পর ওই জমাট রক্তকে আল্লাহ তা'আলা গোশতের টুকরায় পরিণত করেন। যেমনি ভাবে ফেরআউনীদের হাতের রক্তের টুকরা ব্যাঙে পরিণত হত। বা যেমনি ভাবে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার এখানে পাত্রে রক্ষিত গোশতকে পাথরের টুকরা বানিয়ে দিয়েছিলেন।

আর মুসা (আ.) এর প্রসিদ্ধ ঘটনা যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তাতে হযরত মুসার (আ.) লাঠিকে সাপ, আবার সাপকে লাঠি বানিয়ে দিয়েছেন। দৃশ্যত তো হত লাঠি; কিন্তু সেটা না ছিল লাঠি আবার না ছিল সাপ। কেননা, লাঠি সাপ হতে পারে না আর সাপ লাঠি হতে পারেনা। তারপরও লাঠি এমন হলো, তো এর দ্বারা বুঝা যায় যে,

লাঠি হোক বা সাপ

পিঁপড়া হোক বা জিবরাঈল আ.

যমীন হোক বা আসমান

অগ্নি হোক বা পাহাড়

ফোটা হোক বা সমুদ্র অর্থাৎ আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত যা কিছুই হোক না কেন, সব মাখলুক। এইসব আর একটি কাঠের পুতুলের মধ্যে তেমন কোন ব্যবধান নেই। এই সবার মধ্যে “আল্লাহর যে আদেশ” কাজ করছে তা-ই হল আসল। আল্লাহ তা'আলা এই সব শেকেল থেকে যখন চান, যেখানে চান ও যা চান তা-ই হবে। মানবের সৃষ্টিই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। তবে তিন মহা মানবের সৃষ্টি এর ব্যতিক্রম হয়েছে তারা হলেন: হযরত আদম আ. হাওয়া আ. হযরত ঈসা আ.। এদের সৃষ্টিও তাঁর ব্যতিক্রম ধরনের সৃষ্টি। এই সবার মধ্যে রয়েছে তাঁর কুদরত ও নিদর্শন।

শরীরে রক্ত সঞ্চালন করা

আমাদের শরীর আর জিসিম বানানোর তরীকা সেটাই যেটা পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের এই শরীরকে আমরা নিজের মালিকানা মনে করে নিজেদের খেয়াল খুশী মোতাবেক ব্যবহার করছি। অথচ আল্লাহ তা'আলা তা দিয়েছিলেন তাঁর মজী মোতাবেক ব্যবহার করার জন্য। তা আমাদের শরীরের প্রথমত: রক্তের প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর গায়েবী ভাণ্ডার হতে সরাসরি শরীরে রক্তের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আকাশ হতে রক্ত আসতে আমরা দেখিনা। যেমনি ভাবে জ্বরের রক্ত নিয়ে যাওয়াটাও আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না।

হযরত সালমান (রা.) বলেন, একবার জ্বর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে আসার অনুমতি চাইল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? জ্বর বলল, আমি হলাম জ্বর। আমি গোশত কাটি আর রক্ত চুষি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কুবাওয়ালাদের নিকট চলে যায়। তাই হল। এই জ্বর কুবা বাসীদের এতটা রক্ত চুষল আর গোশত কাটল যে, তাদের চেহারা হলদে বর্ণের হয়ে গেল। এমনকি তারা এসে নবীজীর নিকট জ্বরের অভিযোগ করল।

তিনি বললেন, তোমরা চাইলে আমি দু'আ করব আর আল্লাহ জ্বর উঠিয়ে নিবেন। আর চাইলে তা থাকবে এবং তোমাদের গোনাহ মাফ হবে। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহলে জ্বর থাকুক।

(বিদায়া-নিহায়া)

কোন কিছু দৃষ্টিগোচর না হওয়া তা না হওয়ার বা না থাকার প্রমাণ বহন করেনা। এ বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এভাবে বুঝাচ্ছেন-

وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ

بِغَيْرِ حِسَابٍ

“তুমিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাব, আবার জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাব। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিসীম জীবনোপকরণ দান কর।”

(আলে ইমরান: ২৭)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, আমরা তো আমাদের রক্তকে মুরগীর ডিমের মাধ্যমে চিনেছি যে, আল্লাহই হলেন রক্ত। বন্ধুগণ! আমাদের এই ধোকা লেগেছে যে, আমরা

পয়সা দ্বারা প্রতিপালিত হই-

দোকান দ্বারা প্রতিপালিত হই-

মেহনত দ্বারা প্রতিপালিত হই-

বেত-খামার দ্বারা প্রতিপালিত হই-

চাকরী দ্বারা প্রতিপালিত হই- পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় কোন মিথ্যা নেই যে আমরা চীজ ও আসবাব বা চাকরী বাকরী দ্বারা প্রতিপালিত হই। হযরত জী ইউসুফ রহ. বলতেন, যে ইনসান এ জাতীয় ইয়াকীন ও বিশ্বাস নিয়ে মরবে সে কবরে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে না।

হযরত সুফিয়ান ছাউরী রহ. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. প্রকাশ্যে বলতেন যে, যমীন তামা হয়ে গেলে, আকাশ লোহা হয়ে গেলে এবং পৃথিবীতে কোন রসদ-সামান ও মানুষজন না থাকলেও আমার এই চিন্তা আসবে না যে, আমার আহার বিহারের কি ব্যবস্থা হবে?

হযরত হাসান বসরী রহ. বলতেন, আসমান যমীন ও চীজ আসবাব যদি এমনিই হয়ে যায় তথাপিও যদি কারো ভিতরে এই খেয়াল আসে যে, আমার পানাহারের কি ব্যবস্থা হবে? তো এই খেয়াল তার ভিতরের শিরকের কারণেই এসেছে। তার ঈমান নেই।

হযরত উমর রা. বলেন, শুধু ঈমানের বেশ-ভূষা ধরলেই ঈমান পাওয়া যায় না। (কানযুল উম্মাল)

হযরত ইবনে মাউদ রা. বলেন, ঈমানের চূড়ায় না পৌছলে ঈমানের হাকীকত পর্যন্ত পৌছা যায় না। আর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের চূড়ায় পৌছা যাবে না যতক্ষণ না তার নিকট ১- ধনাঢ্যতার চেয়ে ফকীরী, ২- বড় হওয়ার চেয়ে ছোট হওয়া প্রিয় না হবে। ৩- এবং তার নিকট যদি প্রসংশাসাকারী ও নিন্দাকারী সমান সমান না হয়। (হিল্‌ইয়া)

হযরত উমর রা. বলেন, লোকসকল! ভিতর ঠিক কর, বাহির এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা নিজেদের পরকালের জন্য কাজ কর, তোমাদের দুনিয়াবী কাজ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আপনা-আপনিই হয়ে যাবে। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

কামাই ছাড়া কিভাবে প্রতিপালিত হবে?

একসাথী অপর সাথীকে চার মাসের জন্য তাশকীল করলেন যে, ঈমান আমল শিখার জন্য আপনিও চার মাসের জন্য আল্লাহর রাস্তায় চলুন। সে বলল, আমার ইয়াকীন আছে যে, আল্লাহ পালেন, তবে আমি

চার মাসের জন্য গেলে আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও বিবি বাচ্চার কি হবে? আমি একাই কামাই করি। আমি যদি কামাই না করি তাহলে নিজে খাব কি? আর তাদেরকেই বা কি খাওয়াব? প্রতিপালনকারী তো আল্লাহই তবে কামাই রোযগার না করলে আমরা কি ভাবে প্রতিপালিত হব?

তাশকীলকারী: ভাই এই জিনিষ শিখার জন্যই তো বের হতে হয় যে, আপনি দোকান দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছেন না; বরং আপনাকে এবং আপনার ঘরওয়ালা সবাইকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই নিজ কুদরতে লালন-পালন করছেন। মানুষকে যেহেতু পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে তাই সে চীজ ও আসবাব দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছে বলে দেখছে।

অন্যথায় আসলে সমস্ত মাখলুককে আল্লাহ তা'আলাই নিজ কুদরতে লালন করছেন। কিন্তু সে এ বিষয়টি মানতে রাজী নয়। তার হিসেবে তার ধারণাই ঠিক। কেননা, বিশ বছর যাবত সে তার কামাই দ্বারাই প্রতিপালিত হতে দেখছে। এই অবস্থা সবারই যে, পালবেন তো আল্লাহ তা'আলা তবে কামাই ছাড়া কেমনে? পয়সা ছাড়া কি ভাবে?

তাশকীলকারী আরও বললেন, ভাই আপনি যা বলছেন, এটা আপনার ভুল ইয়াকীন এবং ইহা একেবারেই ডাহা মিথ্যা যে, কেউ কোন কিছু দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছে; বরং আল্লাহই প্রতিপালন করছেন। উদাহরণ স্বরূপ এক্সিড্যান্ট হয়ে রাস্তায়ই পড়ে গেলেন। ওখান থেকে উঠিয়ে লোকেরা আপনাকে নিকটবর্তী কোন নার্সিং হোমে নিয়ে গেল। সেখান হতে ডাক্তাররা মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়ে দিল। সেখানের ডাক্তারগণ বললেন যে, দেখুন তার উভয় হাত পা নীল হয়ে যাচ্ছে। অপারেশন করে কেটে ফেলতে হবে। তাহলে সে জানে বাঁচবে। বলুন, আপনার ঘরওয়ালারা ডাক্তারকে কি বলবে? উক্ত সাথী বলল, আমার পরিবারের লোকজন বলবে, ডাক্তার সাহেব। তার অপারেশন করুন।

তাশকীলকারী : অপারেশন করার পর যখন আপনাকে অপারেশন থিয়েটার হতে বাহিরে আনা হবে তখন আপনার পাঁচ ফুটের বডি আড়াই ফুট হয়ে যাবে। তারপর তিন মাস পর্যন্ত আপনাকে হাসপাতালেই থাকতে হল। ক্ষত শুকালে হাসপাতাল হতে বাড়ী নিয়ে আসা হল। বাড়ী আসার পর এখন না আপনি দোকানের উপযুক্ত, না দোকান আপনার উপযুক্ত। যেহেতু আপনি দোকান আর মেহনত দ্বারাই প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। তাই বাড়ী আসার দুই চার দিন পরই আপনি মরে যাবেন,

তাই না? কেননা এখন তো আর দোকানে কামাই করতে যেতে পারেন না। আর আপনার মৃত্যুর দুই চার দিন পর আপনার ঘরওয়ালারাও মরে যাবে। কেননা, এখন তো আর আপনি তাদেরকে প্রতিপালন করছেন না!!!

সাথী : না আমি মরব না।

তাশ: মরবেন না কেন? আপনি তো দোকান দ্বারাই প্রতিপালিত হচ্ছিলেন।

সাথী: আল্লাহ অন্য কোন রাস্তা খুলে দিবেন।

তাশ: এর মানে কি এই নয় যে, আপনি দোকান দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছেন না।

আর আপনার ধারণা ছিল ভুল। আচ্ছা বলুন তো! এখন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কি ভাবে পালবেন।

সাথী: কোন উত্তর দিতে পারল না।

তাশ: আমি বলব কি কিভাবে তখন আপনি প্রতিপালিত হবেন?

সাথী: বলুন।

তাশ: এখন আপনার শ্বশুর প্রতি মাসে দুবাই থেকে পাঁচ হাজার করে পাঠাবে যে, জামাই এখন অকর্মা হয়ে গেছেন। তো তিনি মেয়ে ও সন্তানদের মুহাব্বতে টাকা পয়সা পাঠাবেন। এখন ওখান থেকে পয়সা আসতে দেখে দোকান হতে ইয়াকীন হটে শ্বশুরের উপর যাবে। তখন বলবেন যে, পালবেন তো আল্লাহ তবে শ্বশুর ছাড়া কেমনে? তো আপনি ছাড়া যেভাবে আল্লাহ পালেন, শ্বশুর ছাড়াও তিনিই পালবেন। যেহেতু প্রতি মুহূর্তে মানুষের পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে তাই সে চীজ দ্বারা, আসবাব দ্বারা, মাল দ্বারা ও লোক দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছে বলে দেখবে। খোদার কসম! আসলে সবাইকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই পালবেন। দোকান নয়, শ্বশুরও নয়।

তাশকীলকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন যে, দুবাইয়ে যদি আপনার শ্বশুর মরে যায়?

সাথী: তখন আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন রাস্তায় পালবেন।

তাশ: আচ্ছা বলুন তো যমীন যদি তামা হয়ে যায়, আসমান লোহা হয়ে যায় আর পৃথিবীতে আপনি ও আপনার পরিবারের ৫ সদস্য ছাড়া আর কেউ না থাকে! তাহলে আপনাদের মৃত্যু হয়ে যাবে?

হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন; মানুষের মনে ফেরেশতার পক্ষ হতে এক ধরনের খেয়াল আসে। আবার শয়তানের পক্ষ হতে এক ধরনের খেয়াল আসে। শয়তানের পক্ষ হতে এই খেয়াল আসে যে, সে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে যে, গাইরুল্লাহ থেকে হয়। আল্লাহই যে সব কিছু করেন এমন নয়। আর ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার হুকুম মেনে নেয়া এবং আল্লাহই যে সব কিছু করেন এর উপর উদ্বুদ্ধ করেন। সুতরাং এমন খেয়াল পেলে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে তার উপর জমা চাই। আর শয়তানের আনীত খেয়াল হলে, তাকে শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করা চাই।

(তিরমিযী)

মুরগীর ডিম থেকে আল্লাহর পরিচয়

সুতরাং যখন শয়তান তোমার অন্তরে এই খেয়াল আনে তখন মুরগীর ডিমের কথা চিন্তা করে নিজেকে বুঝাতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা এই খোসার ভেতর থেকে কিভাবে বাচ্চা তৈরী করেন এবং তার লালন পালন করেন। মুরগীর বাচ্চা ডিমের ভেতরে চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ থাকে। খোসার নিচে একটা ওয়াটার প্রফ পর্দা থাকে যেটা খোসা ভাংগার পরে আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। আমরা যখন এই ডিম সেদ্ধ করে কিংবা আমলেট করে খাই তখন কিন্তু তার এই হাত পা ঠোঁট রং বেরং এর বাহার কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু আল্লাহ পাক স্বীয় কুদরতে ঐ খোসার ভেতরে মুরগীর আকৃতি বানিয়ে দেন অতঃপর সেখানেই তাকে রুহ দান করে তার রিয়িকের ব্যবস্থা করেন। এই মুরগীর বাচ্চা আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ব্যবহার করে যখন খোসা ভেংগে বাইরে বের হয়ে আসে তখনই যদি জবাই করা হয় তাহলে তার দেহ থেকে রক্ত ঝরতে দেখা যাবে। একথা আমাকে এজন্য বলতে হচ্ছে যে, সারা দুনিয়াতে আজ একথার চর্চা হচ্ছে যে, ফলমূল খাদ্য শস্য, ভিটামিন, টনিক, আয়ুর্বেদিক ইত্যাদি দ্বারা শরীরে রক্ত তৈরী হয়। আচ্ছা তাহলে বলুনতো এই মুরগীর বাচ্চা যার নিকট বাইরে থেকে এ ধরনের খানা পিনা যাওয়ার কোন সুযোগ নেই তার দেহে এই রক্ত আসল কোথেকে? উত্তরে লোকেরা বলবে যে, এটা আল্লাহ তা'আলা স্বীয়

কুদরতে করে থাকেন। তবে মানুষের শরীরের রক্ত মাংস, খাদ্য-পানীয় দ্বারা তৈরী হয়ে থাকে। খুব ভাল করে মনে রাখবেন এরকম কথা মুখ দিয়ে বের করা তো দূরের কথা মনে মনে চিন্তা করলেও শিরকের গোনাহ হবে। কেননা, এভাবে আল্লাহ পাকের কুদরতের সাথে আমরা এসব জিনিসকে শরীক করছি। বস্তুত ইমান না শেখার কারণেই এরকম কথা বলা হচ্ছে। আর বেবুনিয়াদ কথার কারণেই উম্মতের কষ্টার্জিত পয়সা এসব জিনিস ক্রয়ের পিছনে ব্যয় হচ্ছে।

নাভীর নাপাক রক্ত দ্বারা প্রতিপালন

দোস্ত-বুয়ুর্গ! ঠিক এভাবেই আজকাল একথাও বলা হয়ে থাকে যে, মায়ের পেটে অবস্থানরত শিশুকে আল্লাহ তা'আলা নাভীর অপবিত্র রক্ত দ্বারা প্রতিপালন করে থাকেন। এখন এখানে আমাদেরকে একথাটা চিন্তা করতে হবে যে, মানুষ যাকে আশরাফুল মাখলুকাত বলা হয়। ফেরেশতাদের দ্বারা যাকে সিজদা করানো হয়েছে, তাকে নাভীর অপবিত্র রক্ত দ্বারা প্রতিপালন করা হল আর মুরগীর বাচ্চা যাকে আমাদের খাদ্য হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি রিযিক দান করছেন। তাহলে রিযিক পাওয়ার দিক দিয়ে মুরগীর বাচ্চা তো মানুষের তুলনায় উত্তম হয়ে গেল! আসলে এখানে প্রকৃত ঘটনা হল, মায়ের পেটে চার মাসে যখন শিশুর আকৃতি গঠিত হয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা রুহজগত থেকে তার শরীরে রুহ প্রেরণ করেন। দেহের মধ্যে রুহ আসার পরে দেহের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন নাকি কারো শরীর থেকে রুহ বের হয়ে গেলে সেই শরীরের আর কোন কিছু প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু রুহ থাকাবস্থায় খাদ্য-পানীয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। মায়ের পেটে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে বাচ্চাকে রিযিক দিয়ে থাকেন। রিযিক পাওয়ার পরে সে স্বাভাবিক ভাবে পেশাব-পায়খানাও করে। এই তথ্য দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বাচ্চাকে মায়ের পেটে রিযিক পৌছানো হয়। কেননা মানুষ যদি খাদ্য-পানীয় গ্রহণ না করে তাহলে তো তার পেশাব-পায়খানা হওয়ার কথা নয়।

মুহতারাম দোস্ত-বুয়ুর্গ! রিযিকের সম্পর্ক হচ্ছে সরাসরি আল্লাহ তা'আলার যাতের সাথে। হযরত উমর (রা.) বলেন, বান্দা আর তার

রিযিকের মধ্যে একটা পর্দা পড়ে আছে। বান্দা যদি সবার করে তাহলে তার রিযিক স্বয়ং তার কাছে এসে উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে সে যদি হালাল হারামের পরওয়া না করে কামাইয়ে লেগে যায় তাহলে কেমন যেন সে উক্ত পর্দাটা ফেড়ে ফেলল। কিন্তু পাবে অতটুকু যতটুকু তার তাকদীরে আছে।

(কানযুল উন্মাল-৮/২১০)

এই দুনিয়াতে রিযিক প্রাপ্তির বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা বান্দার ধারণার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা পোষণ করবে আমি তার সাথে তেমনই মুআমালা করব।

এখন মানুষের দিলে যদি মাল দ্বারা হওয়ার একিন থাকে তাহলে তার কাজ মাল দ্বারা হবে। আর যদি দুনিয়াতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আসবাব সামগ্রী দ্বারা হওয়ার একিন হয় তাহলে এই রাস্তায় হবে। কিন্তু এর ক্ষতি এই হবে যে, মানুষের মনে যে জিনিষ দ্বারা হওয়ার একিন হবে সে উক্ত জিনিষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) একবার কোথাও যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে কিছু লোককে অপেক্ষমান দেখতে পেলেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার? তোমরা এখানে থেমে আছ কেন? তারা বলল, সামনের রাস্তায় একটা সিংহ দাঁড়িয়ে আছে, এই জন্য আমরা যেতে সাহস পাচ্ছি না। একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সাওয়ারী থেকে নেমে পায়ে হেটে সিংহের নিকট পৌঁছলেন এবং তার কান ধরে গর্দানে একটা খাশা মেরে ভাগিয়ে দিলেন।

ফেরার পথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) নিজেকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন হে ইবনে উমর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যই বলেছিলেন যে, ইবনে আদমের উপর ঐ জিনিষই চাপিয়ে দেয়া হয় যা সে ভয় করে। বনী আদম যদি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় না করত তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর কাউকে চাপিয়ে দিতেন না। বনী আদম যে জিনিষের মধ্যে নিজের লাভ বা ক্ষতির একিন করে তাকে সেই জিনিষেরই হাওয়ালা করে দেয়া হয়। বদী আদম যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে নিজের লাভ বা

মসজিদ আবাদের মেহনত
কৃতির একিন না রাখে তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তাকে অন্য কারো
হাওয়ালা করবেন না।

এভাবে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে
কেরামের মধ্যে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা থেকে হওয়ার একিন পয়দা
করে দিয়েছিলেন। ফলে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী
ছিলেন। সর্বদা তারা নিজেদেরকে আল্লাহ পাকের প্রতি মুহতাজ মনে
করতেন। কারো সাথে কোন মুআমালা হলে সেটাকে আল্লাহরই সোপর্দ
করতেন, নিজেদের সমস্ত জরুরত তারা আল্লাহ পাকের সামনে পেশ
করতেন, নিজেদের রিয়িক তারা সেই পথে হাসিল করতেন যে পথ
তাদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়েছেন।
আজকাল তো আমরা শুধু খানা-পিনাকেই রিয়িক মনে করি। কাউকে
যদি জিজ্ঞাসা করা হয় রিয়িক কাকে বলে? তাহলে সে এই সব জিনিসের
নামই বলবে। অথচ মানুষের শারীরিক সব প্রয়োজনকেই রিয়িক বলা
হয়।

দেখুন এই শরীরের খালেক এবং মালেক আল্লাহ। বর্তমান বিশ্বে
বসবাসরত ৭০০ কোটি মানুষের মধ্যে কারোরই শরীর ২০০ বছর আগে
এই পৃথিবীতে ছিল না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে এই শরীর তৈরী
করে পরীক্ষার জন্য মানুষকে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এই শরীর
কিভাবে গঠিত হয়েছে তারও সংবাদ আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের
মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। মায়ের পেটে কোন মাধ্যম
ছাড়াই আমাদের শরীরের চাহিদা পূরা করেছেন। বাচ্চাদানীর ভেতরে
রক্ত, বাতাস এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। অতঃপর যখন আমরা
মায়ের পেট থেকে বাইরের জগতে পা রাখলাম তখন আমাদের শরীরে
শক্তি, চোখের পাওয়ার, মুখে বুলি, কানে শ্রবণশক্তি, ব্রেনে চিন্তা শক্তি
সহ সমস্ত জরুরত পূরা করলেন এবং আজ পর্যন্ত সেই জরুরত আল্লাহ
তা'আলাই পূরা করে চলেছেন।

এই সমস্ত জরুরত যদি অর্থের বিনিময়ে দিতেন যে, দৃষ্টি শক্তির
জন্য প্রতি সেকেন্ডে ১ পয়সা, বলার জন্য প্রতি সেকেন্ডে ১ পয়সা।
শোনার জন্য প্রতি সেকেন্ডে ১ পয়সা যেমন মোবাইলে প্রতি সেকেন্ডের
জন্য ১ পয়সা নেয়া হয় তাহলে বলুনতো মানুষের অবস্থা কি দাঁড়াত?

আল্লাহ তাআলা এসব জিনিষের জন্য চার্জ ধার্য্য করলে মানুষ দিতে বাধ্য হত, কিন্তু আল্লাহ রক্বুল আলামীন বান্দার প্রতি বড় সহানুভূতিশীল তিনি নিজ দায়িত্বে বান্দাকে রিয়িক পৌছে দিচ্ছেন। এখন আমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করি যে, শরীরের এই সমস্ত জরুরত শ্রবণ শক্তি, চিন্তা শক্তি, বাক শক্তি, দৃষ্টি শক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দিতে পারেনা। তিনি কোন চার্জ ছাড়া, কোন মেহনত ছাড়া আমাদেরকে এগুলি দিচ্ছেন, তাহলে ডাল- রুটি, কাপড় চোপড় এগুলি কি আমরা আমাদের মেহনত দ্বারা হাসিল করছি?

না না এসব জিনিষও আল্লাহ তাআলা স্বীয় মেহেরবানীতে আমাদেরকে দান করছেন। যদিও আমরা দেখছি আসবাব দ্বারা এগুলি হচ্ছে কিন্তু এটি আল্লাহ তাআলার পরীক্ষা। তিনি এই পৃথিবীতে মানুষের রিয়িক তাদের ধারণার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। মানুষের ধারণা যদি মাল থেকে হওয়ার উপর হয় তাহলে তাদের কাজ মাল দ্বারাই হবে। আর যদি দুনিয়াবী অন্যান্য আসবাব দ্বারা হওয়ার একিন হয় তাহলে সেই পথেই তাদের হাজত পূরা হবে কিন্তু এর ক্ষতি হল, যে জিনিষের উপর তাদের একিন হবে তাদেরকে সেই জিনিষের মুখাপেক্ষী করে দেয়া হবে।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে একিন ছিল সেই একিন আমাদের মধ্যে পয়দা করার জন্য সর্ব প্রথম কাজ হল ঈমান শিখতে হবে। এই জন্যই আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষের জন্য সাহাবায়ে কেরামের আমলকে নমুনা হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন।

মোহতারাম দোস্ত! ঈমান না শেখার কারণে মুসলমান আজ পরীক্ষার জিনিষ দ্বারা সান্তনা লাভ করছে। অথচ সান্তনা ও আরাম আল্লাহ তাআলা শরীরের সহীহ ব্যবহারের মধ্যে রেখেছেন, আমাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যদি আল্লাহ তাআলার মর্জিমত ব্যবহৃত হয়, চোখ-কান-মুখ, দেমাগ যদি হারাম থেকে বেঁচে যায় তাহলেই প্রকৃত শান্তি ও কামিয়াবী হাসিল হবে। আর এই জন্য মসজিদে ঈমানী হালকা কায়েম করে ঈমান শিখতে হবে এবং এত পরিমাণ শিখতে হবে যাতে আমাদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হারাম থেকে বেঁচে যায়। নতুবা মুসলমান আজ হালাল উপার্জন এবং হারাম খাওয়া সত্ত্বেও-

হারাম বলছে

হারাম দেখছে

হারাম শুনছে

হারাম চিন্তা-ভাবনা করছে

ঈমান না শেখার কারণেই মুসলমান আজ ঈমান থেকে উদাসীন। যদি তার ঈমানের ফিকির আসত তাহলে যে হারাম থেকে বেঁচে যেত। মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে এসেছে, রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন মুমিনের দ্বারা যখন কবীরা গোনাহ সংঘটিত হয় তখন ঈমানের নূর তার দিল থেকে বের হয়ে তার মাথার উপর ছায়া করে থাকে। তাওবা না করা পর্যন্ত উক্ত নূর আর তার দিলে প্রত্যাবর্তন করে না। এখন চিন্তা করুন তো আমাদের কতটুকু ফিকির আছে ঈমানের ব্যাপারে? আমরা কি কখনো উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, কবীরা গোনাহ কি কি? তার সংখ্যা কত?

ঈমান না শেখার কারণে উম্মত আজ ইলমকে ঈমান মনে করে বসে আছে। আর নামায রোযা হজ্জ যাকাতকে ইসলাম মনে করে রেখেছে, অথচ এগুলি তো ইসলামের বুনিয়াদ, এগুলি ইসলাম নয়। দাওয়াতের এই মুবারক মেহনতের মাধ্যমে এটাই চাওয়া হচ্ছে যে, মুসলমান যেন তার ঈমানের ব্যাপারে ফিকিরমান্দ হয়ে যায়। আর এই জন্যই স্ব স্ব মসজিদে বেশি বেশি ঈমানী হালকা কায়ম করতে হবে।

ঈমান শেখার ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম আল্লাহ পাকের যাতের একিন নিজের অন্তরে ফিট করতে হবে। সেই আল্লাহ যার নামের বরকতে এই সারা জাহান টিকে আছে। হাদীস শরীফে আছে যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে একজন আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালাও থাকবে ততদিন এই সমস্ত কায়েনাত বহাল থাকবে আর যেদিন কারো মুখ থেকে আল্লাহ শব্দ বের হবে না সেদিন দুনিয়াতে চাই কোটি কোটি মানুষ থাকুক আর তাদের মধ্যে-

এক কোটি ইঞ্জিনিয়ার থাকুক

এক কোটি ডাক্তার থাকুক

এক কোটি প্রফেসর থাকুক

এক কোটি বৈজ্ঞানিক থাকুক

এক কোটি কোটিপতি থাকুক

প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ১০ কেজি করে স্বর্ণ থাকুক

কিন্তু আল্লাহ বলনেওয়ালা যদি কেউ না থাকে তাহলে সেদিন এই আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে, যমিন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে, তারকারাজী খসে পড়বে, সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, মোট কথা সারা জাহান ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন বসে বসে চিন্তা করুন। সেই দুনিয়া পাওয়ার জন্য আমরা কি-না করছি। অথচ কে কতটুকু পাবে তা আগেই ফায়সালা হয়ে গেছে। “আল্লাহ” শব্দ এতই শক্তিশালী যে, আমরা ঈমান না শেখার কারণে এই শব্দের শক্তি সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। আপনার ভাই থাকে আমেরিকা আপনি এখান থেকে মোবাইলে তাকে বললেন হ্যালো, জবাবে সেও বলল হ্যালো। মাত্র এক সেকেন্ড সময়। এই এক সেকেন্ডে ১৩৫৫৫ কি.মি. পথ পাড়ি দিয়ে ইথারে ভেসে আপনার হ্যালো আমেরিকায় শোনা গেল। কেউ যদি এই কথা ধরতে চায় অটকাতে চায় তাহলে কারো সাধ্য নাই। বেশি থেকে বেশি টেপ করে রাখতে পারে। একজন চোরের সামনে পুলিশ শব্দ উচ্চারণ করলে এর কত শক্তি তা উপলব্ধি করা যায়। চোরের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। তাহলে চিন্তা করুন, যে আল্লাহর নামে সারা জাহান কায়ম আছে সেই আল্লাহর একিন যদি কেউ নিজের অন্তরে পয়দা করে নেয় তাহলে এই সারা বিশ্ব কি তার পিছনে পিছনে চলবে না? চোরের অন্তরেও আল্লাহ পাকের যাতের একিন আরো মজবুতভাবে বিদ্যমান থাকতে হবে। যদি আমরা এই একিন পয়দা করতাম তাহলে আল্লাহ শব্দ শোনার সাথে সাথে আমাদের শরীর কেঁপে উঠত। আল্লাহর নাম শুনেও যদি আমাদের শরীরে কম্পন সৃষ্টি না হয় তাহলে তো চিন্তা করা উচিত যে, ঈমান আছে কিনা যা নাই আর একজন মুসলমানের জন্য এটা কিভাবে সম্ভব? কেননা স্বয়ং আল্লাহ রক্বুল আলামীন কুরআন পাকে ইরশাদ করেছেন, ঈমানদার তো তারা যাদের সামনে আল্লাহর নাম নিলে তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে, আর যখন আল্লাহ তাআলার সংবাদ তাদেরকে শোনানো হয় তখন তাদের একিন বৃদ্ধি পায় আর তারা শুধু স্বীয় প্রতিপালকের উপরেই ভরসা করে। (সূরায়ে আনফাল- আয়াত-২)

এখন কেউ যদি নিজের অন্তরে আল্লাহর যাত এবং তার রব হওয়ার গুণের একিন পয়দা করে নেয় তাহলে যখনই তার মুখ থেকে কোন কথা উচ্চারিত হবে তখনই সেটা সরাসরি আরশে আযীমে পৌছে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরত দ্বারা সরাসরি তার সমস্যাকে

সমাধান করে দেবেন। সাহায্যে কেরাম এভাবেই নিজেদের বড় বড় সমস্যার সমাধান করিয়ে নিয়েছেন।

একবার হযরত আবু রাইহানা (রাঃ) নৌকায় কোথাও সফর করেছিলে, নৌকায় বসে তিনি সুই দিয়ে কিছু সেলাই করছিলেন হঠাৎ করে বাতাসের একটা ঝাপটা এসে তার সুইটা পানিতে ফেলে দিল। তিনি আসমানে দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে দুআ করলেন, হে আল্লাহ তোমার ইবাদতের কসম! তুমি আমার সুইটা ফিরিয়ে দাও। একথা বলে পানির দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখেন তার সুইটা পানির উপরে ভাসছে। তিনি হাত বাড়িয়ে সেটিকে তুলে নিলেন।

(আল ইছাভাহ-২/১৫৭)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) স্থায়ী বাঁদিকে আযাদ করে দিলেন। বাঁদি ঘটনাক্রমে অন্ধ হয়ে গেলে কাফেররা বলতে লাগল আমাদের দেবতা লাভ-উজ্জা তোমাকে অন্ধ করে দিয়েছে। বাঁদি বলল, তোমরা মিথ্যা বলছ, বাইতুল্লাহর কসম! লাভ-উজ্জা কারো কোন ক্ষতি করতে পারে না কারো কোন উপকার করতে পারেনা। এতটুকু বলতে না বলতেই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল।

(আল ইছাভা, ৪/৩১৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার হযরত উমর (রাঃ) আমাদেরকে বললেন চল কওমের জমি থেকে ঘুরে আসি। আমরা তার সাথে রওয়ানা হলাম, হযরত উবাই ইবনে কাআব (রাঃ) জামাআতের কিছুটা পিছনে রয়ে গেলেন, এমন সময় একখন্ড মেঘ এসে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করল। হযরত উবাই ইবনে কাআব দুআ করলেন, হে আল্লাহ! এই বৃষ্টির কষ্ট থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন। অতঃপর আমরা বৃষ্টির মধ্যে চলতে লাগলাম কিন্তু আমাদের কোন কিছু ভিজল না। আমরা দুজন যখন হযরত উমর (রাঃ) এবং তার সাথীদের সাথে মিলিত হলাম তখন দেখলাম তাদের সমস্ত কিছু ভিজে একাকার হয়ে গেছে। আমাদের শরীর শুকনা দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি অন্য কোন পথ দিয়ে এসেছ? আমি তাকে বললাম, উবাই ইবনে কাআব দুআ করেছিলেন, হে আল্লাহ! বৃষ্টির কষ্ট আমাদের থেকে দূর করে দাও, একথা শুনে হযরত উমর (রাঃ) বললেন, তোমরা দুআর মধ্যে আমাদেরকেও শরীক করলেন কেন?

(মুত্তাখাবুল কাযা- ৪/১৩২)

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) এর পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি একটা মশক নিয়ে হেটে যাচ্ছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমার এতে কি

আছে? সে বলল, শরাব। হযরত খালেদ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! এটাকে সিরকা বানিয়ে দাও। এদিকে উক্ত ব্যক্তি সাধিদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আজ আমি তোমাদের নিকট এমন এক শরাব নিয়ে এসেছি যা আরবের কারো নিকট নেই। একথা বলে সে যখন তা পরিবেশন করার জন্য ঢালল তখন দেখা গেল মদের পরিবর্তে সিরকা বের হচ্ছে। সে বলল, কসম খোদার! খালেদের বদদুআ লেগে গেছে এতে।

(আল বেদায়া ওয়াল নেহায়া, ৭/১১৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) একবার সংবাদ পেলেন যে, যিয়াদ হেজাযে মুকাদ্দাসেরও গভর্নর হতে চাচ্ছে। তিনি তার প্রজা হয়ে থাকতে পছন্দ করলেন না তাই দু'আ করলেন হে আল্লাহ! তুমি স্বীয় মাখলুকের মধ্যে যার ব্যাপারে চাও তাকে হত্যা করে তার গোনাহের কাফফারার সুরত করে থাক, ইবনে যিয়াদ যেন হত্যাকাণ্ডের শিকার না হয়, সে যেন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং তার দু'আ কবুল হল এবং যিয়াদের বৃদ্ধাংগুলিতে প্লেগের গুটি বের হয়ে পরবর্তী জুমা আসার আগেই মারা গেল।

(মুনতাব্বুল কাযা- ৫/১৩১)

কারবালার ঘটনার সময় প্রতিপক্ষের একজন দাঁড়িয়ে জানতে চাইল তোমাদের মধ্যে হুসাইন আছে? লোকেরা বলল হাঁ আছে। সে ব্যক্তি হযরত হুসাইনের সামনে বেয়াদবীর সুরে বলল, তোমার জন্য জাহান্নামের সুসংবাদ। হযরত হুসাইন (রাঃ) বললেন, আমি সুসংবাদ পেয়েছি যে, সেখানে অতি মেহেরবান দয়ালু রব থাকবেন আর সুপারিশকারী নবী থাকবেন যার সুপারিশ কবুল করা হবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল নরাদম! তুই কে? সে বলল, আমি ইবনে জুওয়াইরাহ! হযরত হুসাইন (রাঃ) দু'আ করলেন হে আল্লাহ, তাকে টুকরা টুকরা করে তুমি জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। সাথে সাথে দু'আ কবুল হল। তার সওয়ারী জোরে এক লাফ দিল, ফলে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে গেল। তার এক পা রেকাবীতে আটকে রইল আর মাথা নিচের দিকে ঝুলে গেল। এই অবস্থায় ঘোড়া ছুট দিলে তার মাথা আর শরীর মাটিতে আছাড় খেতে খেতে টুকরা হয়ে গেল। আর রেকাবীর সাথে শুধুমাত্র তার পা ঝুলে রইল।

(হাইসামী, ৯/১৯৩)

আসমান থেকে নেমে এল আঙ্গুরের থোকা

হযরত লাইস ইবনে সাআদ (রাঃ) বলেন, একবার আমি হজে গেলাম। মক্কায় পৌঁছে আসরের নামাযের সময় আবু কুবায়েস পর্বতে আরোহন করে দেখি এক ব্যক্তি দুআ করছে ইয়া রান্দি, ইয়া রান্দি অতঃপর ইয়া রাক্বা রাক্বা তার পরে ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, তারপর ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইউম অতঃপর ইয়া কাইউম ইয়া কাইউম বলছে। অতঃপর সাতবার ইয়া আরহামার রাহিমীন বলে দুআ করছে হে আল্লাহ! আমার আঙ্গুর খেতে মন চাচ্ছে আমার জন্য আঙ্গুর পাঠিয়ে দাও আর আমার চাদর দুটিও পুরাতন হয়ে গেছে তারও ব্যবস্থা করে দাও। হযরত লাইস বলেন, আল্লাহর কসম! তার মুখ থেকে এই কথা শেষ হওয়ার আগেই আসমান থেকে আঙ্গুর ভর্তি একটা টুকরি তার সামনে এসে হাজির হল এবং তার ভেতর দুটি চাদরও রাখা ছিল। অথচ তখন সারা আরবে কোথাও আঙ্গুরের কোন নাম-গন্ধও ছিলনা, সে টুকরি থেকে আঙ্গুরের একটি ছড়া খাওয়ার জন্য বের করলে আমি তাকে আওয়াজ দিয়ে বললাম, এই আঙ্গুরে কিন্তু আমারও অংশ আছে। সে পিছনে ফিরে আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, এতে তোমার অংশ কিভাবে আছে? আমি বললাম আপনি যখন দুআ করছিলেন আমি তখন আমিন আমিন বলছিলাম। একথা শুনে তিনি উক্ত থোকাটি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন এটি এখানে বসেই খেয়ে নাও। আমি এগুলি এখানে বসে খাওয়ার জন্যই চেয়েছি, ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়। আমি আঙ্গুরগুলি খেলাম তাতে কোন বিচি ছিল না এবং এমনই সুস্বাদু ছিল যে, জীবন भर তার স্বাদ আমি ভুলতে পারি নাই।

(রওজুর রিয়াহীন)

হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (রহঃ) একবার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সফর করছিলেন। পথিমধ্যে এক খৃষ্টানের সাথে মুলাকাত হল, সে বলল হে মুহাম্মাদী, আমাকেও তোমার সাথে নিয়ে চল। ইবরাহীম বললেন, ঠিক আছে চল। অতঃপর সাত দিন তারা ক্ষুৎ-পিপাসায় পথ চললেন, সাতদিন পর খৃষ্টান বলল হে মুহাম্মাদী, আজ কিছু খানা-পিনার ব্যবস্থা কর। আমি আল্লাহর নিকট দুআ করলাম হে আল্লাহ! এই কাফেরের সামনে আজ আমাকে অপদস্ত কর না, আমাদের খানা-পিনার ব্যবস্থা করে দাও। দুআর সাথে সাথে আসমান থেকে একটি দস্তুরখানা নেমে

এল যাতে ভুনা গোসত, রুটি এবং তাজা খেজুর এবং পানি ভর্তি লোটা ছিল। আমরা তা থেকে পেট ভরে খেয়ে সামনের দিকে রওয়ানা হলাম। সাতদিন পর্যন্ত আমরা আবার খানা-পিনা ছাড়া চলতে লাগলাম। সাতদিনের দিন আমি উক্ত খুঁটানকে বললাম, আজ তুমি খানা-পিনার ব্যবস্থা কর। একথা শুনে সে একটি লাঠিতে ভর দিয়ে আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে মুখে কিছু বলল, ব্যস তক্ষুনি আসমান থেকে দুটি দস্তুরখানা নেমে এল। যাতে প্রতিটি জিনিস আমার দস্তুর খানার চেয়ে দ্বিগুণ ছিল। এটা দেখে আমি পেরেশান হয়ে গেলাম এবং মনের দুঃখে খানা খেতে অস্বীকৃতি জানালাম। উক্ত খুঁটান বলল, আপনি আগে খেয়ে নিন অতঃপর আমি আপনাকে দুটি সুসংবাদ শোনাব। আমি বললাম আগে সুসংবাদ শোনাও তাহলে আমি খাব। সে বলল তোমার জন্য প্রথম সুসংবাদ হল, আমি মুসলমান হয়ে গিয়েছি আর দ্বিতীয় সুসংবাদ হল, এই যে আসমান থেকে খানা এল এটা আপনারই তোফায়েলে, কেননা আপনার দোহাই দিয়ে আমি আল্লাহ পাকের নিকট দুআ করেছিলাম।

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একবার আমি একাকি কাফেলার সাথে সফরে ছিলাম, রাস্তায় এক মহিলাকে দেখলাম সে কাফেলার আগে আগে চলছে। আমি ভাবলাম সে মনে হয় দুর্বল তাই আগে আগে চলছে। আমার পকেটে কয়েকটি দেহরহাম ছিল আমি বের করে তাকে দিতে গেলাম এবং বললাম কাফেলা যখন থামবে তখন আমাকে তালাশ কর। আমি চাঁদা তুলে আরো কিছু তোমাকে দেয়ার ব্যবস্থা করব। আমার কথা শুনে সে নিজের হাত উপরের দিকে উঠালে মনে হল তার হাতের মুষ্টি কোন কিছু দ্বারা ভরে গেল। অতঃপর সে যখন হাত খুলল তখন দেখলাম তার হাত দেহরহাম দ্বারা পরিপূর্ণ। সেগুলি আমাকে দিয়ে সে বলল, তুমি তো পকেট থেকে বের করে দিয়েছিলে আর আমি গায়েব থেকে নিলাম।

(ফাজায়েলে সাদাকাত)

শরীরের সাতটি অঙ্গের হরকতের নাম হচ্ছে আমল

দোস্ত-বুয়ুগ! আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার নেয়ামকে মানুষের আমলের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। মানুষের শরীর থেকে যেমন আমল প্রকাশ পাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার সাথে ঐ রকম মুআমালা হবে। কেননা গায়েবী নেয়ামের সম্পর্ক হচ্ছে আমলের সাথে, আসবাবের

সাথে নয়। এখন প্রশ্ন হল আমল কাকে বলে? তো মনে রাখতে হবে শরীর থেকে প্রকাশ পাওয়া হরকতকে আমল বলে। মানুষতো নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতকে আমল মনে করে। কিন্তু মূলত আমল বলা হয় শরীরের সাতটি অঙ্গ যথা চোখ, কান, মুখ, দেমাগ, হাত-পা এবং লজ্জাস্থান দ্বারা সংঘটিত কাজকে। শরীরের এই অঙ্গ সমূহ যদি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তার মর্জিমত ব্যবহৃত হয় তাহলে আসমানের উপর থেকে তার জন্য সফলতা দানকারী ফায়সালা অবতীর্ণ হবে এবং গায়েবী নেয়াম তার সাহায্যে চলে আসবে। পক্ষান্তরে আমরা যদি আমাদের ইচ্ছামত শরীরকে ব্যবহার করি তাহলে যিল্লাতি, বেইযযতি, কষ্ট, মুসীবত ইত্যাদি থেকে আমাদেরকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ফায়সালাকৃত বিষয়। দুনিয়ার সম্পদ, পদ-পদবী, ক্ষমতা যতই আমাদের নিকট থাকুক ফেরেশতাদের দ্বারা পরিচালিত গায়েবী নেয়াম আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলে তখন তার সাথে অবস্থানকারী ফেরেশতা যে কিনা তাকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে। এই মিথ্যা কথার দুর্গন্ধে তার থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক মানুষের জন্য দুজন এমন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয় যারা আনেওয়ালা বিপদ-আপদ থেকে তাকে হেফাজত করে, কিন্তু যখন তাকদীরে লিখিত ফায়সালা সামনে চলে আসে তখন এই ফেরেশতাদ্বয় তার নিকট থেকে সরে যায়। (আবু দাউদ শরীফ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলে তখন তার এই মিথ্যার দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতা এক মাইল দূরে সরে যায়। (তিরমিযী শরীফ)

হযরত বেলাল সুবানী (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আল্লাহকে খুশি করার জন্য এমন কোন কথা বলে বসে যার তেমন একটা গুরুত্ব তার নিকট থাকে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট সেই কথাটি এত পছন্দনীয় হয় যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার উপর সম্ভ্রষ্ট হওয়ার ঘোষণা দিয়ে দেবেন। (তিরমিযী শরীফ)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন যেন আমরা আমাদের যবান থেকে বের হওয়া কথার হাকীকত উপলব্ধি করতে পারি। হযরত হিশাম ইবনে আছ উমাবী (রাঃ) বলেন, যখন আমরা রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের রাজ প্রাসাদে পৌঁছলাম এবং জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করলাম তখন উক্ত প্রাসাদ এমনভাবে দুলতে লাগল যেমন গাছের ডাল বাতাসে দোল খায়। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া)

মুখ থেকে বের হওয়া কথা যে কত শক্তিশালী তা যদি এখনও বুঝে এসে না থাকে তাহলে নিম্নের হাদীসটি দ্বারা তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখনই কোন বান্দা স্বীয় যবানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করে তখনই তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং এই কালেমা সোজা আরশে যেয়ে উপস্থিত হয়। যদি কিনা সে কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সমস্ত আসমান যমীন মিলে যদি একটি প্রতিবন্ধকতা হয়ে যায় তবুও কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেই প্রতিবন্ধকতা ভেদ করে আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

(মুসনাদে বাযযার)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোন ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তখন তার জন্য আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় এবং সেটি সরাসরি আরশে পৌঁছে যায়, আর আরশের উপর নুরের একটি স্তম্ভ আছে সেটি তখন দুলতে থাকে। আল্লাহ তাআলা সব কিছু জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কেন দুলছ? স্তম্ভ বলে এই কালেমা পাঠকারী ব্যক্তির গোনাহ এখনও মাফ হয় নি। আল্লাহ তাআলা বলেন তুমি থেমে যাও। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

মেরে দোস্ত-বুয়ুর্গ! এটা তো হচ্ছে শুধুমাত্র মুখ দিয়ে উচ্চারিত কথার প্রতিক্রিয়া। অনুরূপভাবে হাত-পা, চোখ, কান, দেমাগ এবং লজ্জাস্থান দ্বারা সংঘটিত কাজেরও এরকম প্রতিক্রিয়া রয়েছে যা আমরা হয়ত উপলব্ধি করতে পারি না। এই জন্যই ফাজায়েলের তালীম করতে হবে যাতে করে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলির সহীহ

ব্যবহার হলে আসমান থেকে আমাদের জন্য কি ধরনের ফায়সালা হবে। পক্ষান্তরে আমরা যদি নিজেদের মন মত এগুলিকে ব্যবহার করি তাহলে তার জন্য কি ধরনের ফায়সালা রয়েছে। বর্তমান যুগে বিষয়টিকে মোবাইল কিংবা কম্পিউটারের সাথে তুলনা করা দ্বারা বুঝা যেতে পারে। যেমন মনে করুন মোবাইল বা কম্পিউটারের কি বোর্ড রয়েছে। তার যে বাটনে আপনি আঙুল রাখবেন সাথে সাথে তার ফল স্ক্রীনে দেখতে পাবেন। এমন না যে, কোন উচ্চ পদস্ত বা সম্পদশালী ব্যক্তি বাটন টিপলে এক রকম ফলাফল দেখবে আর কোন অসহায় কিংবা গরীব মানুষ টিপলে আরেক রকম ফলাফল দেখবে। কেননা মোবাইল বা কম্পিউটার নির্মাতা তো আগেই জানিয়ে দিয়েছে যে, এই বাটন টিপলে এই হবে আর এই অপশনে গেলে এই হবে। এখন কেউ যদি এই নিয়ম না শোনে, নিজের ইচ্ছামত সেটাকে ব্যবহার করে তাহলে পেরেশানীতে পড়বে। চাই তার ব্যবহারকারী ধনী হোক কিংবা গরীব

লেখা-পড়া জানুক বা না জানুক

গ্রাম্য হোক বা শহুরে

পুরুষ হোক কিংবা নারী

ঠিক অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলাও মানুষের শরীর তৈরী করে আখিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে তার ব্যবহারের নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহার করবে সে দুনিয়ায় এবং আখেরাতে কামিয়াব হবে।

মানুষের রুখি-রুগি

কাপড়-বাসস্থান

সুস্থতা-অসুস্থতা

ইজ্জত-যিল্লত

সফলতা-ব্যর্থতা

এই সব জিনিসের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলা মানুষের অংগ প্রত্যংগ থেকে প্রকাশ পাওয়া হরকতের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। শরীরের এই সমস্ত হরকতকেই আমল বলা হয়। মানুষ যদি ঈমান না শেখে তাহলে সে নিজের প্রয়োজন ও জরুরতকে দুনিয়াতে ছড়িয়ে থাকা আসবাবের সাথে জুড়ে নেয়। অথচ হযরত জিবরীল (আঃ) থেকে নিয়ে পিপীলিকা

পর্যন্ত সমস্ত মাখলুকের প্রতিটি হাজত ও জরুরত আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরতেই পয়দা করেন এবং পূর্ণ করেন।

হযরত উযায়ের (রাঃ) এর রুহকে তার শরীর থেকে একশত বছর পর্যন্ত পৃথক রাখা হয়েছিল, এই দীর্ঘ সময়ে তার খানা-পিনা, পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন পড়েনি। কেননা শরীরের সাথে রুহের সংযোগ ছিল না।

অনুরূপভাবে আসহাবে কাহাফের কিছু লোক যারা একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, আল্লাহ তাআলা ৩০৯ বছর পর্যন্ত তাদের রুহকে শরীর থেকে পৃথক করে দিয়েছিলেন। ফলে তাদের খানা-পিনা, পেশাব-পায়খানার কোন প্রয়োজন পড়েনি। এভাবে আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন মানুষের শরীর থেকে তার রুহকে বের করে নেন এবং তার নির্ধারিত হায়াত পূরা করার জন্য আবার উক্ত রুহ ফিরিয়ে দেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষ যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন তার রুহকে আরশে উঠানো হয়। যে রুহ আরশে পৌছে জেগে যায় তার স্বপ্ন সত্য হয় আর যেটা আগেই জেগে যায় তার স্বপ্ন মিথ্যা হয়। (হাইসামী)

মানুষের রুহ যতদিন পর্যন্ত তার শরীরে থাকে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষার জন্য তার শরীরে বিভিন্ন রকমের হাজত এবং চাহিদা সৃষ্টি করেন এবং এর দ্বারা তিনি দেখতে চান যে, আমার বান্দা এই হাজতগুলিকে কোন রাস্তায় পূরা করে। শিরকের রাস্তায় নাকি তাওহীদের রাস্তায়। শিরকের রাস্তা হল মানুষ নিজের প্রতিপালকের মধ্যে আসবাবকে শরীক করে নেয়। সে বলে আল্লাহই করেন কিন্তু আসবাব ছাড়া কিভাবে পালবেন? আর তাওহীদ ওয়ালা রাস্তা হল এই একিন রাখা যে, আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় কুদরতে পালছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তিনিই স্বীয় কুদরত দ্বারা পালতে থাকবেন। তবে সেই কুদরত দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের আহকাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরীকায় পালন করতে হবে।

দেখুন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে মানুষের প্রতিপালনের জন্য দুটি রাস্তা দিয়েছেন। একটি রাস্তা হচ্ছে কায়েনাত ওয়ালা আর অপরটি হল আহকামওয়ালা। কায়েনাত ওয়ালা রাস্তা হচ্ছে পরীক্ষার জন্য আর

আহকামাত ওয়ালা রাস্তা হচ্ছে পুরকৃত হওয়ার রাস্তা। বিষয়টি কম্পিউটারের মাধ্যমে বুঝা যেতে পারে। আপনি যদি কম্পিউটারে উর্দুতে কিছু লিখতে চান তাহলে আপনাকে উর্দু সফটওয়্যার লাগাতে হবে। এখন এই সফটওয়্যার আপনি দুভাবে হাসিল করতে পারেন। হয়ত বাজার থেকে কিনে আনবেন তাহলে আপনাকে জান-মাল আর সময় লাগাতে হবে নতুবা ইন্টারনেট থেকে সরাসরি কম্পিউটারে ডাউনলোড করবেন। সরাসরি এই উপকৃত হওয়ার জন্য আপনাকে কম্পিউটার শিখতে হবে। তাহলে এক রাস্তা হল সরাসরি দোকান থেকে কিনে আনা আর অপর রাস্তা হল উপগ্রহ থেকে উপকৃত হওয়া। সাহায্যে কেরাম আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী নিজেদের শরীর ব্যবহার করা শিখেছেন। ফলে তারা সরাসরি আসমানের উপর থেকে নিজেদের জরুরত পুরা করে নিতেন। যেমন হযরত খুবায়ের (রা.) কে ফাঁসি দেয়ার জন্য যখন একটি কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছিল তখন একদিন তার হাতে টাটকা আংগুরের একটি থোকা দেখা গেল। অথচ সারা আরবে তখন আংগুরের মৌসুম ছিল না।

হযরত জী মাওলানা ইউসুফ (রাহ.) এর আখেরী বয়ান

এই কথাগুলি হযরত জী মাওলানা ইউসুফ (রাহ.) মৃত্যুর বিশ দিন আগে পাকিস্তান সফরের সময় বলেছিলেন। তিনি বলেন, ভাইয়ো, দোস্ত-বুয়ুর্গ! নিজেদের জীবনের রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐ তরীকা নিয়ে আসুন যা আল্লাহ রাক্বুল আলামীন স্বীয় যাত দ্বারা প্রতিপালন করার জন্য দান করেছেন। কেননা নুবুওয়াত প্রাপ্তির পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের নিকট থেকে পাওয়ার কোন রাস্তা অবলম্বন করেন নাই। তায়েফ, তাবুক, ইয়ামান, নাজদ, হায়রামাউত প্রভৃতি এলাকার লোকদেরকে তিনি নামাযের কথা বলেছেন। কালেমার দ্বারা আল্লাহ পাকের যাত থেকে হওয়ার একিন পয়দা করতে বলেছেন। মানুষের মধ্যে যখন এই একিন পয়দা হবে যে, আল্লাহই রব আর তার থেকে নেয়ার রাস্তা হল নামায এবং সাথে সাথে এই কথার দাওয়াত দিতে থাকবে তখন দুনিয়ার তারতীবই বদলে যাবে। তাই নামাযকে ভেতর থেকে বানাতে হবে। কেননা সমস্যার সম্পর্ক

ভেতরের সাথেই। যখন এইটা বানিয়ে নেবে তখন নামাযের বুনিয়াদে তিনটি লাইন ঠিক করে নেবে। পরিবার, কারবার এবং মুআশারাত।

নবীওয়ালা রাস্তায়ও ঘর এবং কারবার আছে। আর মানুষের রাস্তায়ও ঘর এবং কারবার আছে। কামাই দ্বারা প্রতিপালন হয় না বরং প্রতিপালন তো আল্লাহর হুকুম মানার দ্বারা হয়। এখন প্রশ্ন হবে কামাই দ্বারা যদি প্রতিপালন না হয় তাহলে কামাই করি কেন? এর উত্তরের জন্য নামায দ্বারা প্রতিপালনের রাস্তা বেছে নিতে হবে। নামাযের পরে এখন দুটি রাস্তা-কামাই করবে বা করবে না। যদি কেউ না কামায় শুধু নামায পড়েই আল্লাহ থেকে নেয় তাহলেও ঠিক আছে কিন্তু শর্ত হল কামাই কর না তবে কোন মাখলুকের সম্পত্তিও আত্মসাত কর না।

কারো নিকট সুওয়ালা কর না

কারো থেকে কিছু পাওয়ার আশা কর না

কষ্টে পড়লে হা-হতাশ কর না

সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর সম্বল থাক

এই সব জিনিষ যদি অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায় তাহলে আর কামাই রোযগারের কোন প্রয়োজন নেই। এর উজ্জল নমুনা হলেন চারো সিলসিলার আউলিয়ায়ে কেরাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত ঈসা (আ.) এবং আসহাবে সুফফা। এবং এই ধরনের আরো লাখো দৃষ্টান্ত রয়েছে যারা শুধুমাত্র নামাযের মাধ্যমে নিজেদের কাজ চালিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং যদি না কামাই করতে চায় তাহলে আত্মসাৎ, অন্যের মালের প্রতি লোভ, সুওয়ালা, হাহতাশ, ভীত সম্বলিত না থাকতে হবে। আর যদি কামাই করতে চায় তাহলে তার জন্য বুনিয়াদী শর্ত হল কামাইয়ের দ্বারা হবে এই একিন যেন না হয়। আল্লাহ তা'আলা নামাযের মাধ্যমে দেবেন। আমি জীবন ধারণের জন্য কামাই করব না। বরং কামাইয়ের মধ্যে নবীজীর তরীকা চালু করার জন্য কামাই করব। কামাইয়ের জগতে আমরা আল্লাহর হুকুম জারী করার জন্য যাচ্ছি। আমাদেরকে এই একিন হাসিল করতে হবে যে, আল্লাহই পালেন সুতরাং আল্লাহর হুকুম লংঘন করে আমরা কামাই করব না।

যেসব জিনিষ হালাল তার দ্বারা কামাই করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হালাল অপরটি হারাম। গাভী, বকরী, উট ইত্যাদি হালাল। আবার এই হালালের মধ্যেও হালাল হারাম রয়েছে। যদি বিসমিল্লাহ

আল্লাহ্ আকবার বলা হয় কিন্তু গর্দানে ছুরি না চালিয়ে পেটে চালান তাহলেও এটা হারাম হয়ে গেল। সুতরাং কামাই করতে হলে মাসায়িলের পাবন্দীর সাথে কামাই করতে হবে। নামাযের মধ্যে যেটা বলা হয় কামাইয়ের মধ্যেও সেটাই বলতে হবে। অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। এভাবে যখন আমরা কামাই করব তখন দুনিয়াতে উন্নতি অগ্রগতি হবে। ভূমিকম্প, বন্যা, তুফান, বোম্বিং ইত্যাদিতে আমাদের বাড়ি-ঘর আর দোকান-পাটের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা এটা হচ্ছে আল্লাহর মাহবুবের তরীকা। চাই তা একটা টং ঘরই হোকনা কেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকা মত হলে তার শক্তি পারমাবিক বোমার চেয়েও বেশি।

বেলাল পার্ক লাহোর থেকে ঈমানের ডাক

মৃত্যুর আঠার ঘন্টা পূর্বে অর্থাৎ ১৯৬৫ সনের ১লা এপ্রিল লাহোরের বেলাল পার্কে মাগরিবের নামাযের পরে হযরত জী মাওলানা ইউসুফ (রহ.) যে ঐতিহাসিক বয়ান করেছিলেন সেটি এখানে তুলে ধরা হচ্ছে যাতে করে ঈমানের এই বিষয়টি আমাদের বুঝে আসে।

হযরত (রহ.) বলেন - إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا আল্লাহ আমাদের “রব” এটা শুধু একটা শব্দ নয় বরং একটা মেহনত। যেমন কেউ যদি বলে দোকানের দ্বারা আমার চলে, চাষের দ্বারা আমার চলে, চাকরী দ্বারা আমার চলে, কিংবা হুকুমত দ্বারা আমার চলে তাহলে এটা শুধু একটা শব্দ নয় বরং একটা মেহনত। এতটুকু বলার পরে তার মেহনত শুরু হয়ে যায়। যমিন কেনে, হাল চালায়, বীজ বপন করে, পরিচর্যা করে, মোট কথা এই শব্দের পিছনে একটা লম্বা চওড়া মেহনতের যিন্দেগী রয়েছে। অনুরূপভাবে যখন কেউ বলে “আল্লাহ আমার রব” তাহলে এতটুকু বলার দ্বারাই কথা শেষ হয়ে যায় না; বরং কেবল তো শুরু হল, আল্লাহই যখন পালনে ওয়ালা তখন অন্যের দ্বারা পালিত হওয়ার একিন দিল থেকে বের করে দিতে হবে। এটা হল প্রথম মেহনত যে, যমীন আসমান এবং এর মধ্যস্থিত জিনিষ দ্বারা হয় না বরং আল্লাহই আমাকে প্রতিপালন করেন। এই মেহনত করে দিলের একিন তৈরী করতে হবে। এই একিনকে রক্তে রক্তে প্রবেশ করানোর জন্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকা নিজের জীবনে আনতে হবে।

“আল্লাহ তা’আলাই আমাকে পালেন” এই কথার হাকীকত অন্তরে বদ্ধমূল করার জন্য মূলক-মাল, ব্যবসা, ক্ষেত-খামার এগুলির মেহনত নয় বরং এই শব্দের উপর নবী ওয়ালা মেহনত করতে হবে। অর্থাৎ মেহনত করে এই হাকীকত পর্যন্ত পৌছতে হবে যে, আল্লাহর দ্বারাই আমরা প্রতিপালিত হই। এই প্রতিপালনের জন্য তিনি ক্ষেত-খামার, দোকান-পাটের মুখপেক্ষী নন। তিনি স্বীয় হুকুম দ্বারা প্রতিপালন করেন। এই হাকীকত যদি दिलের মধ্যে বসে যায় তাহলে আমেরিকা, রাশিয়া তোমাদের জুতার তলায় থাকবে। বাস শর্ত হল, এটা শুধুমাত্র যেন কথার কথা না হয় বরং অন্তরে যেন এর হাকীকত বসে যায়। আর এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকায় মেহনত করতে হবে। ইবাদতের দ্বারা আল্লাহ তা’আলা পালেন এই বিশ্বাসে যদি ইবাদত করা হয় তাহলেই সেটা दिलে বসবে। ইবাদত হচ্ছে নামায। নামাযে যেমন সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ সহীহভাবে ব্যবহৃত হয় নামাযের বাইরেও তদ্রূপ সহীহ ব্যবহার হতে হবে।

একবার হযরত জী (রহ.) বয়ানে বললেন, লোক সকল! আমরা ধোকার মধ্যে পড়ে আছি। আমরা মনে করছি আসবাব দ্বারা আমরা প্রতিপালিত হচ্ছি। অথচ এটা ধোকা। আল্লাহ তা’আলা আসবাব দ্বারা পালেন না। বরং কুদরত দ্বারা পালেন। আল্লাহ তা’আলার কুদরত দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য ইবাদত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জাহেরের খেলাফ করে দু’আর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের কুদরত দ্বারা নিজেদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করা শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহর কুদরত দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের যাত ও সিফাতের একিন পয়দা করতে হবে। আল্লাহর ইবাদত, আল্লাহর বান্দাদের সাথে সহমর্মিতা, খেদমতে খালক, ইখলাসে আমল ইত্যাদির মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরাম দু’আর মধ্যে শক্তি হাসিল করেছিলেন। দু’আ এমন একটি হাতিয়ার যার দ্বারা সর্বাবস্থায় কামিয়াবী অর্জন করা সম্ভব। এই জন্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে দু’আর দ্বারা নিজেদের জরুরত পূরা করার

নিয়ম খুব ভাল ভাবে শিখিয়েছেন। ইনফিরাদী এবং ইজতিমায়ী সর্বক্ষেত্রে দু'আই ছিল তাদের মূল হাতিয়ার।

মোহতারাম দোস্ত-বুয়ুর্গ! আজ আমরা ঈমান শিখার প্রয়োজন এই জন্য মনে করিনা যে, আমাদের সমস্ত কাজ মালের দ্বারা হতে দেখছি। তাই মাল কামাই করা শিখা অতঃপর মাল কামাইয়ে আত্মনিয়োগ করা আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুখারী শরীফের একটি হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের উপর আমি দারিদ্রতার ভয় করি না বরং আমার ভয় হয় তোমাদের জন্য দুনিয়া প্রশস্ত করে দেয়া হবে যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য করা হয়েছিল। অতঃপর তোমরাও তাতে দিল লাগাবে যেমনটা তারা লাগিয়েছিল। আর এটাই তোমাদের ধ্বংসের কারণ হবে। যেমনটি তাদের হয়েছিল।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, যে জিনিষকে আমাদের প্রিয় নবীজী আমাদের জন্য ফিতনার কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন আমরা মুসলমানরা সেই জিনিষকেই নিজেদের রব আর মাবুদ বানিয়ে নিয়েছি। আমরা যে মালকে আমাদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছি তা বোঝার সহজ পদ্ধতি হল, আপনি যখন ঘরে প্রবেশ করবেন আর ঘর থেকে বলা হবে আটা শেষ হয়ে গেছে আটা নিয়ে আসুন। তখন যদি চট করে আপনার চিন্তা পয়সার দিকে ধাবিত হয় আর যে পকেটে পয়সা আছে সেটা চেক করতে থাকেন। পকেটে না থাকলে আলমারীর কথা খেয়াল আসবে নতুবা ব্যাংকের কথা মনে পড়বে, মোট কথা হল বিভিন্ন জিনিষের খেয়াল আসবে কিন্তু আল্লাহ পাকের কথা মনে আসবে না। এখন তাহলে বুঝুন আমরা কাকে রব বানিয়ে বসেছি? এখন বুঝে আসবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত সত্য সংবাদই না আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। আমরা মুখে তো একথা বলছি যে, পিপড়া থেকে নিয়ে জিব্রাইল (আ.) পর্যন্ত, যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত, ক্ষুদ্র কনা থেকে নিয়ে পাহাড় পর্যন্ত, ফোটা থেকে নিয়ে দরিয়া পর্যন্ত কারো দ্বারা কিছু হয় না অথচ দিলের মধ্যে মাল থেকে হওয়ার একিন বসে রয়েছে যে, করনেওয়ালা যাত তো আল্লাহই তবে মাল ছাড়া কিছু হয় না।

অথচ রাসূলে আকরাম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এই সারা দুনিয়া হচ্ছে মুরদার। আর একথা স্পষ্ট যে, মুরদার দ্বারা কিছুই হয় না। মোহতারাম দোস্ত! যে দুনিয়াকে সৃষ্টি করার পরে আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয়বার তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি আজ ঈমান না শেখার কারণে, আমরা সেই দুনিয়াকেই সমস্যার সমাধানকারী মনে করে বসে আছি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, কোন বান্দা আল্লাহ পাকের নিকট যত মর্যাদাশীলই হোক না কেন, যখন দুনিয়ার কোন বস্তু তার হস্তগত হয় আর সেটা গ্রহণ করে তাহলে আল্লাহ পাকের নিকট তার মর্যাদা হ্রাস পায়।

(হিলয়াতুল আউলিয়া-১/৩০৬)

মোহতারাম দোস্ত! আমরা যখন আমরা ঈমান শিখব এবং আমলী তাকাজা পুরা করব আর আমাদের শরীরকে আল্লাহ পাকের মর্জিমত ব্যবহার করব যেমন নাকি রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবহার করা শিখিয়ে গেছেন তাহলে আমাদের সাথেও ঐ মুআমালা হবে যা হয়েছিল আদমিয়া এবং সাহাবীদের সাথে।

* বনী ইসরাঈলকে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মান্না সালওয়া খাইয়েছিলেন।

* হযরত মারয়ামের জন্য তার বন্ধ কামরায় জান্নাতী ফল প্রেরণ করেছিলেন।

* বনী ইসরাঈলের জন্য একটা পাথর থেকে বারটা পানির ঝর্ণা জারী করেছিলেন।

* মুসা (আ.) কে যখন তার মা কাঠের সিন্দুকে ভরে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তখন তিন দিন তিন রাত তার হাতের আংগুল থেকে মধু জারী করে দিয়েছিলেন।

* হযরত ইবরাহীম (আ.) কে নমরুদ যখন আগুনে নিক্ষেপ করেছিল তখন সেখানে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আসমান থেকে খানা পাঠিয়ে তার মেহমানদারী করেছিলেন অথচ বাইরে থেকে ওটাকে অগ্নিকুণ্ড মনে হত।

* হযরত ইবরাহীমের মোকাবেলায় আসা নমরুদ ও তার বাহিনীকে মশার পাল দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

* আবরাহার হস্তিবাহিনীকে পাখির ঝাঁক দ্বারা হালাক করেছিলেন।

* বনী ইসরাঈলের জন্য লোহিত সাগরে রাস্তা বের করে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

* হযরত ইউসুফ (আ.) কে গোলাম থেকে বাদশাহ বানালেন।

* হযরত ইসমাইল (আ.) এর জন্য যমযম সৃষ্টি করলেন।

* হযরত আইউব (আ.) এর পচা গলা শরীরকে সুস্থ করে দিলেন।

* হযরত ঈসা (আ.) কে দুশমন থেকে বাঁচিয়ে আসমানে তুলে নিলেন।

* হযরত সালেহ (আ.) এর কওমের জন্য পাহাড় থেকে উটনী বের করলেন।

* হযরত ইউনুস (আ.) কে চল্লিশ দিন মাছের পেটে রেখে বাইরে বের করলেন।

* হযরত দাউদ (আ.) এর হাতে লোহাকে মোম বানিয়ে দিলেন।

* হযরত সুলাইমান (আ.) কে সমস্ত মাখলুকের উপর বাদশাহ বানালেন।

* হযরত মুসা (আ.) এর লাঠিকে যাদুকরদের সামনে অজগর বানিয়ে দিলেন।

* হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর বিবি হযরত সারার ইয্যতের খাতিরে ফেরআউনের শরীরকে পাথর বানিয়ে দিলেন।

* হযরত দাউদ (আ.) কতক বনী ইসরাঈলকে শুকর আর বানরে পরিণত করলেন।

* হযরত নূহ (আ.) এর কওমকে মহাপ্লাবনে ডুবিয়ে দেখালেন।

দোস্ত-বুয়ুর্গ! আমরাও যদি আল্লাহর হুকুমকে মজবুতীর সাথে আঁকড়ে ধরি তাহলে আল্লাহ তা'আলা জাহেরের খেলাফ শুধুমাত্র স্বীয় কুদরত দ্বারা আমাদের সকলের জরুরত পূরা করে দেবেন। সেটা এভাবে যে,

* কখনো প্রয়োজনের জিনিষ অন্যের দ্বারা হাদিয়া করিয়ে পূরা করবেন।

* কখনো হযরত মিকদাদ (রা.) এর মত ইদুরের দ্বারা স্বর্ণমুদ্রার ব্যবস্থা করবেন।

- * কখনো হযরত উম্মে আয়মানের মত আসমান থেকে পানি ভর্তি বালতি নামিয়ে দেবেন।
- * কখনো হযরত খুবায়ের (রা.) এর মত আসমান থেকে বন্ধ কামরায় আংগুরের থোকা পাঠিয়ে দেবেন।
- * কখনো উম্মে সায়েবের মত বাচ্চাকে যিন্দা করে দেবেন।
- * কখনো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের মত হাতে ধরা গাছের ডালকে তরবারী বানিয়ে দেবেন।
- * কখনো হযরত তুফায়েল ইবনে আমর দাওসীর মত কোড়া থেকে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাবেন।
- * কখনো হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের মত সমুদ্রকে অনুগত করে দেবেন।
- * কখনো হযরত তামীমে দারীর মত আগুনকে বশীভূত করে দেবেন।
- * কখনো হযরত উমর (রা.) এর মত আপনার আওয়াজকে তিনশ মাইল দূরে পৌছে দেবেন।
- * কখনো হযরত আলা ইবনে হাজরামীর মত সমুদ্রকে অনুগত করে দেবেন।
- * কখনো হযরত হামযা ইবনে আমর আসলামীর মত আপনার আংগুল থেকে টর্চের মত আলোর ব্যবস্থা করে দেবেন।
- * কখনো হযরত সাফীনার মত সিংহকে পথ প্রদর্শক বানাবেন।
- * কখনো সাহাবায়ে কেরামের মত সমুদ্র থেকে আশ্রয় মাছ পাঠিয়ে দেবেন।
- * কখনো হযরত আবু মুআল্লাকের মত আপনার দুশমনকে হালাক করার জন্য চতুর্থ আসমান থেকে ফেরেশতা পাঠিয়ে দেবেন।
- * কখনো হযরত য়ায়েদ ইবনে হারেসার মত সপ্তম আসমান থেকে ফেরেশতা পাঠিয়ে আপনাকে সাহায্য করবেন।
- * কখনো হযরত উমামার মত আপনার জন্য কামরার মধ্যে তিনশত স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দেবেন।
- * কখনো বদর-উছদের মত আপনার জন্যও আসমান থেকে ফেরেশতা নেমে আসবে।

* কখনো হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর মত আপনার জন্য এক বছর পর্যন্ত তোশাদান থেকে খেজুর বের করে খাওয়াতে থাকবেন।

* কখনো হযরত উক্বাশা ইবনে মিহসানের মত আপনার জন্যও কাষ্টখণ্ডকে তরবারী বানিয়ে দেবেন।

* কখনো রাতের অন্ধকারে জনৈক সাহাবীর মত আপনার লাঠি থেকে আলো বের করে টর্চের কাজ চালিয়ে দেবেন।

* কখনো হযরত উবাই ইবনে কাআবের মত বৃষ্টির মধ্যেও ভিজে যাওয়া থেকে হেফাজত করবেন।

* কখনো হযরত খালেদ ইবনে অলীদের মত মদকে সিরকা বানিয়ে দেবেন।

* কখনো হযরত আওফের মত শৃংখল খুলে দুশমনের বন্দীদশা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন।

* কখনো হযরত হিশাম ইবনে আছের মত দুশমনের আক্রমণের সময় তার **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ** বলার দ্বারা দুশমনের প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার মত ঘটনা আপনার সাথেও ঘটবে।

আল্লাহ তাআলার গায়েবী নেয়াম

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا يَهِدِي إِلَّا لِيْلْبِشِرِ

তোমার রবের বাহিনীর সংখ্যা তিনি ছাড়া আর কেউ অবগত নয়।

(মুদদাসসির)

* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা যেসব ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন তাদের ব্যাপারে চিন্তা ফিকির কর।

* হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পুরা সাত আসমানে এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও খালি নেই যেখানে ফেরেশতা না আছে। কেউ কিয়াম অবস্থায়, কেউ রুকু অবস্থায় আর কেউ সিজদা অবস্থায় আছে। যখন কিয়ামতের দিন হবে তখন সকলে মিলে তারা আরয করবে হে আল্লাহ! আপনার সত্ত্বা পবিত্র, যেভাবে আপনার ইবাদত করা দরকার ছিল

সেভাবে আমরা ইবাদত করতে পারি নাই। তবে এতটুকু অবশ্যই হয়েছে যে, আমরা আপনার সাথে কাউকে শরীক করি নাই।

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তাতে রুহ সঞ্চার করেছেন, সুতরাং ফেরেশতারা সৃষ্টিগত দিক দিয়ে মাছির চাইতেও ক্ষুদ্র। এতদসত্ত্বেও তাদের সংখ্যা যে কোন মাখলুক থেকে বেশি।

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার মাখলুকের মধ্যে ফেরেশতাদের চাইতে বেশি আর কোন মাখলুক নেই। যমিনে যে কোন জিনিস উৎপন্ন হয় তার সাথে একজন ফেরেশতা কার্যনির্বাহক হিসাবে নিয়োজিত থাকে।

* হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মেরাজের রাতে যখন আমি এবং জিব্রাইল প্রথম আসমানে পৌঁছলাম সেখানে ইসমাইল নামে একজন ফেরেশতার সাথে সাক্ষাত হল যিনি প্রথম আসমানের ফেরেশতাদের সর্দার। তার সামনে সত্তর হাজার ফেরেশতা রয়েছে যাদের প্রত্যেকে আবার এক লক্ষ ফেরেশতার জামাআতের যিম্মাদার।

* হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ফেরেশতাদেরকে নূরের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জিনদেরকে উত্তপ্ত আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ জিনিস দ্বারা যার গুণাগুণ আল্লাহ তাআলা তোমাদের নিকট বয়ান করেছেন অর্থাৎ মাটি দ্বারা।

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মালাকুল মওতকে মানুষের জান কবজ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। জিনদের জন্য অন্য ফেরেশতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আর শয়তান, পাখি মাছ এবং পতঙ্গদের জান কবজের জন্য অন্যান্য ফেরেশতারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে।

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার আমাদের উপর এক টুকরা মেঘ ছায়া করল, আমরা এর দ্বারা বৃষ্টির আশা করতে লাগলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ফেরেশতা মেঘমালাকে পরিচালনা করে তিনি এখানে হাজির হয়েছিলেন

এবং আমাকে সালাম জানিয়ে বললেন, এই মেঘমালাকে ইয়ামানের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। যেখানে এই বৃষ্টি বর্ষিত হবে সেই জায়গার নাম হচ্ছে যুরআ।

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার ইহুদীরা নবীজীর খেদমতে হাজির হয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমাদেরকে বলুন, এই 'রাআদ' কি জিনিস? নবীজী বললেন, রাআদ আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাদের মধ্যে একজন ফেরেশতার নাম যিনি মেঘের দেখভালে নিয়োজিত। তার হাতে আগুনের কোড়া রয়েছে যার দ্বারা তিনি মেঘমালাকে শাসন করেন। যেখানে আল্লাহর হুকুম হয় সেখানে মেঘমালাকে নিয়ে যান। ফেরেশতার সেই ঘোড়ার আঘাতেই বারকতর তথা বিদ্যুৎ চমকায়। ইহুদীরা বলল, আপনি সত্য বলেছেন।

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) কে রাআদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ রাআদকে মেঘমালা সমূহ পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন, যখন আল্লাহ তাআলা কোন মেঘকে কোন জায়গায় পাঠানোর এরাদা করেন তখন রাআদকে নির্দেশ দিলে তিনি সেখানে নিয়ে যান আর মেঘ যখন খন্ড বিখন্ড হয়ে যায় তখন তিনি তাকে ধমক দেন ফলে সেগুলি আবার একত্রিত হয়ে যায়।

* হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মালাকুল মওত যিনি সমস্ত মানুষের জান কবজ করেন তিনি সমস্ত যমিনবাসীদের উপর এমনভাবে কর্তৃত্ব বিস্তার করে আছেন যেমন তোমাদের কেউ স্থায়ী হাতের তালুর উপর কর্তৃত্ব রাখে। মালাকুল মওতের সাথে আযাব এবং রহমত দুই ধরনের ফেরেশতা থাকে। যখন কোন নেক লোকের ওফাত হয় তখন তার নিকট রহমতের ফেরেশতা পাঠানো হয় আর বদলোকের জান কবজ করলে তার নিকট আযাবের ফেরেশতা পাঠানো হয়।

* হযরত কাআব (রাঃ) বলেন, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কাঁদেনা যতক্ষণ তার নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ না করা হয়। ফেরেশতা এসে তার কলিজার সাথে নিজের পাখা ঘষতে থাকে তখন মানুষ কাঁদে।

* হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিছু ফেরেশতা এমন আছেন যারা গাছ থেকে ঝরে যাওয়া পাতার হিসাব লিখতে থাকেন, সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন এলাকার রাস্তা ভুলে যায় এবং কোন

সাহায্যকারী না মেলে তখন সে যেন উচু আওয়াজে বলে- হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আমাকে সাহায্য কর। আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহম করুন। তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা হবে।

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, সমুদ্র একজন ফেরেশতার যিম্মাদারীতে আছে। তিনি যদি তার ব্যাপারে গাফেল হয়ে যান তাহলে সমুদ্রের ঢেউ ঘর-বাড়ি সব গ্রাস করে ফেলবে।

* হযরত যুমরা ইবনে হাবীব (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন বান্দার আমল নিয়ে ফেরেশতা যখন আসমানের উপর পৌঁছায় সেটাকে সে বড় এবং পবিত্র মনে করে তখন আল্লাহ তাআলা তাকে জানিয়ে দেন যে, তোমরা আমার বান্দাদের আমলের নিগরান ঠিক আছে কিন্তু তাদের অন্তরে কি আছে তা শুধুমাত্র আমিই জানি। আমার বান্দা এই আমল আমার জন্য করে নাই। সুতরাং এই আমল সিজ্জীনে নিক্ষেপ কর। অনুরূপভাবে অন্য কোন বান্দার আমল নিয়ে ফেরেশতা যখন আসমানে হাজির হয় তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা আমলের নিগরান কিন্তু दिलের খবর আমি জানি। তার আমলকে কয়েকগুণ বর্ধিত করে সেটিকে ইল্লীনে পাঠিয়ে দাও।

* হযরত হানযালা (রাঃ) বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমার এখানে থাকা অবস্থায় তোমাদের অবস্থা যেমন থাকে সেরকম যদি সব সময় থাকে তাহলে তোমাদের বিছানায় এবং তোমাদের চলার পথে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতে থাকবে। কিন্তু হে হানযালা! এই অবস্থা তো আন্তে আন্তে পয়দা হয়।

(মুসলিম শরীফ)

* হযরত উম্মে ইসফাহ আউসিয়া বলেন, রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান যখন গোনাহ করে তখন গোনাহ লেখার ফেরেশতা যে তার কাঁধে উপবিষ্ট তিনি গোনাহ লিখতে তিন ঘন্টা বিলম্ব করেন এই আশায় যে হয়ত গোনাহ করনেওয়ালা ব্যক্তি এই সময়ের মধ্যে তাওবা করে নেবে।

* হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুমানোর জন্য

বিছানায় যায় তখন একজন ফেরেশতা আর একজন শয়তান তার নিকট আগমন করে, শয়তান বলে যতক্ষণ জেগে থাক কোন খারাপ কাজে লেগে থাক। এখন সে যদি আল্লাহর নাম স্বরণ করতে করতে ঘুমায় তাহলে শয়তান তার নিকট থেকে সরে যায়। আর ফেরেশতা রাতভর তার হেফাজতে নিয়োজিত থাকে। অতঃপর যখন সে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তখন একজন ফেরেশতা এবং একজন শয়তান তার নিকট আগমন করে। শয়তান বলে জাগ্রত হওয়া থেকেই শয়তানী শুরু কর আর ফেরেশতা বলে জাগ্রত হয়ে দিনটাকে ভাল কাজের মাধ্যমে শুরু কর।

(মুসনাদে আহমদ)

* হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শিঙ্গায় ফুকদানকারী ফেরেশতা হযরত ইসরাফীল (আ.) মুখের সাথে শিঙ্গা লাগিয়ে স্থায়ী পেশানী ঝুকিয়ে আল্লাহ পাকের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন। (কানযুল উম্মাল-৭/২৭০)

* হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা পানির খা্যানার উপরে একজন ফেরেশতাকে নিযুক্ত করেছেন। উক্ত ফেরেশতার হাতে একটি পরিমাপ পাত্র আছে। সেই পাত্র হয়েই পানির প্রতিটি ফোটা জমিনে বর্ষিত হয়। কিন্তু হযরত নূহ (আ.) এর তুফানের সময় এমনটি হয়নি বরং সেদিন আল্লাহ তা'আলা সরাসরি পানিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরেশতাকে কিছু বলেন নি। সুতরাং উক্ত ফেরেশতা পানি আটকাতে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও পানি থামে নি। (কানযুল উম্মাল-১/২৭৩)

* হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শবে কদরে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.) কে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ দান করেন। ফলে জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতাদের বিশাল এক জামাআত নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। তাদের সাথে একটি সবুজ পতাকা থাকে। পতাকাটি তারা কাবা শরীফের উপর উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড় এবং যেখানেই মুসলমানদেরকে দাঁড়ানো কিংবা বসাবস্থায় নামায এবং যিকিরে লিপ্ত দেখতে পাও তাদেরকে সালাম কর এবং তাদের সাথে মুসাফাহা কর। আর তাদের দু'আর সাথে আমীন আমীন বলতে থাক। অতঃপর যখন সকাল হয় তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতাদেরকে

মসজিদ আবাদের মেহনত

আওয়ায দিয়ে বলেন, এবার সকলে আসমানে ফিরে চল। তখন সকলে
(মিশকাত শরীফ-২০৬)
আসমানে ফিরে যায়।

* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জুমার দিন ফেরেশতারা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে মসজিদে আগমনকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। অতঃপর যখন খুতবা শুরু হয় তখন তারা লেখা বন্ধ করে খুতবা শোনায মশগুল হয়ে যান। (বুখারী)

* হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, যখন নামাযের জন্য কাতার সোজা করা হয় তখন আকাশের দরজা সমূহ এবং জান্নাত জাহান্নামের সব দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। জান্নাত থেকে হুরেরা উঁকি মেরে মেরে নামাযীদেরকে দেখতে থাকে। (বাইহাকী)

* হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন নামাযের সময় হয় তখন একজন ফেরেশতা ঘোষণা করে বলে, হে আদম সন্তান! ওঠো এবং জাহান্নামের যে আগুন তোমরা নিজেদের জন্য প্রজ্জলিত করেছ নিজেদের গোনাহের কারণে, তা নির্বাপিত কর। (তাবারানী)

* হযরত উসমান গনী (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে এবং সময়ের পাবন্দীর সাথে তা আদায় করবে ফেরেশতারা তার হেফাজত করতে থাকবে।

* হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন বান্দা যখন মিসওয়াক করে নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন একজন ফেরেশতা তার পিছনে এসে দাঁড়ায় এবং অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তার কিরাআত শুনতে থাকে। অতঃপর তার অতি নিকটে এসে তার মুখের সাথে স্বীয় মুখ লাগায় এবং উক্ত নামাযীর মুখ থেকে কুরআনের যে সব শব্দ উচ্চারিত হয় তা সরাসরি ঐ ফেরেশতার পেটে চলে যায়। (বায়হার)

* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয় তখন শয়তান উঁচু আওয়াযে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করতে থাকে। আযান শেষ হলে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে।

অতঃপর যখন ইকামত হয় তখন আবার পলায়ন করে। ইকামত শেষ হলে আবার আসে এবং নামাযীর অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। তাকে কখনো একথা কখনো ওকথা স্বরণ করিয়ে নামাযে বিঘ্ন ঘটাতে চায়। এমন কথা মনে করিয়ে দেয় যা আগে তার স্বরণ ছিল না। এমনকি নামাযীর এই কথাও স্বরণ থাকেনা যে, সে কত রাকাআত পড়েছে।

(মুসলিম শরীফ)

* হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা নামাযের কাতারকে সোজা রাখ। কাঁধকে কাঁধের সাথে মিলাও। কাতার সোজা রাখার ক্ষেত্রে নিজের ভাইদের জন্য নরম হয়ে যাও এবং কাতারের মাঝখানের খালি জায়গা পূর্ণ করে নাও। কেননা, কাতারের মধ্যে খালি জায়গা থাকলে ভেড়ার বাচ্চার মত শয়তান সেখানে ঢুকে পড়ে।

(তাবারানী)

* হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে গ্রাম কিংবা মাঠে তিনব্যক্তি থাকে এবং সেখানে জামাআতের সাথে নামায হয় না তাহলে শয়তান তাদের উপর প্রবল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা জামাআতের সাথে নামায পড়াকে জরুরী মনে কর। নেকড়ে দলছুট বকরীকেই খেয়ে ফেলে। (আর শয়তান হচ্ছে মানুষের জন্য নেকড়ে স্বরূপ)

(আবু দাউদ শরীফ)

* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন ঘুমায় তখন শয়তান তার গর্দানে তিনটি গিরা দিয়ে দেয়। প্রত্যেক গিরায় সে একথা বলে ফুক দেয় যে, ঘুমাতে থাক এখনও রাত বাকি আছে। মানুষ যদি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর নাম নেয় তাহলে তার একটা গিরা খুলে যায় অতঃপর অযু করলে দ্বিতীয় আরেকটি গিরা খুলে যায় এরপর যখন তাহাজ্জুদ পড়ে তখন সর্বশেষ গিরাটিও খুলে যায়।

(আবু দাউদ শরীফ)

* হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক দেখা কেমন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা হল শয়তানের মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া।

(তিরমিযী)

* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সূরায়ে

ফাতেহার শেষে আমীন বলে তখন আসমানে ফেরেশতারাও আমীন বলে। যে ব্যক্তির আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যায় তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী শরীফ)

* হযরত উয়াইস আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঈদের দিন সকাল বেলা আত্মাহু তা'আলা পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে ফেরেশতাদেকে পাঠিয়ে দেন, তারা বিভিন্ন অলিতে গলিতে এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং উচ্চ স্বরে বলতে থাকে (যা সমস্ত মাখলুখ শুনতে পায়) হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উম্মত! সেই মেহেরবান প্রভুর দরবারের দিকে চল যিনি অধিক দানশীল। অতঃপর লোকেরা ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। (তাবারানী)

* হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নামাযী ব্যক্তির ডানে এবং বামে একজন করে ফেরেশতা থাকে। নামাযী ব্যক্তি যদি ঈমানের সাথে সওয়াবের নিয়তে নামায আদায় করে থাকে তাহলে উক্ত ফেরেশতারা নামায নিয়ে উপরের দিকে চলে যায়। আর নামায যদি অসম্পূর্ণ আদায় করে থাকে তাহলে তার মুখে নিক্ষেপ করা হয়। (তারগীব-তারহীব ১/৩৩৮)

* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের নিকট রাতের এবং দিনের ফেরেশতারা আসতে থাকে। তারা ফজর এবং আসরে একত্রিত হয়। অতঃপর যারা তোমাদের সাথে রাত্রি যাপন করেছিল তারা চলে যায়। (বুখারী শরীফ)

* হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যারা অযুতে খেলাল করে এবং খাওয়ার মধ্যে খেলাল করে তারা মোবারক হোক। অযুত মধ্যে খেলাল হল, কুল্লি করা, নাকে পানি দেয়া এবং হাত-পায়ের আঙ্গুলসমূহ খেলাল করা। আর খাওয়ার মধ্যে খেলনা হল, দাঁতে কোন খাদ্য কনা আটকে গেলে সেটা পরিস্কার করা। কেননা, এটা মানুষের সাথে অবস্থানকারী দুই ফেরেশতার জন্য কষ্টের ব্যাপার যে, মানুষ নামাযে দাঁড়াবে আর দাঁতে খাদ্য কনা আটকে থাকবে।

* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রাতের কেলামান কাতেবীন আর দিনের কেলামান কাতেবীন ভিন্ন ভিন্ন। কেননা, দিনের ফেরেশতারা মানুষের মাগরিবের নামায পরিপূর্ণ আদায় করার সাথে সাথে আসমানে চলে যায়। সুতরাং মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নত পড়তে দেবী হয়ে গেলে এটা ফেরেশতাদের জন্য ভারী হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা মাগরিবের ফরজ আদায় করার পরে এই দু'রাকাত সুন্নত আদায়ে বিলম্ব কর না।

(দাইলামী)

* হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া ফতওয়া দেয় আসমান যমীনের ফেরেশতারা তার উপর লানত করতে থাকে।

(ইবনে আসাকীর)

* হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা মালাকুল মাওতকে সমস্ত মাখলুকের রুহ কবজ করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন। তবে যারা সমুদ্রে শহীদ হয় তাদের রুহ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কবজ করেন।

(ইবনে মাজাহ হাদীস-২৬৬৮)

* হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা যদি মৃত্যু এবং তার ফায়সালা সম্পর্কে জানতে তাহলে আশা আকাংখাকে ঘৃণা করতে থাকতে। কোন ঘর এমন নাই যাদেরকে প্রতিদিন মালাকুল মাওত সতর্ক করে না। যখন কারো হায়াত শেষ হয়ে যায় তখন মালাকুল মাওত তার রুহ কবজ করে নেয়। ফলে আত্মীয়-স্বজন যখন কান্নাকাটি আর বিলাপ করতে থাকে তখন মালাকুল মাওত বলে, তোমরা কেন কান্নাকাটি করছ? আল্লাহর কসম নাতো আমি তার হায়াত কিছু কমিয়ে দিয়েছি আর না তার রিয়িক কিছু ছিনিয়ে নিয়েছি। আমাকে তো তোমাদের নিকট ততদিন পর্যন্ত আসতে হবে যতদিন এই ঘরে একটা লোকও থাকবে।

(দাইলামী)

* হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রতিদিন সকালে মানুষ যখন ঘুম থেকে ওঠে তখন একজন ফেরেশতা আওয়ায দিয়ে বলে, হে মাখলুক তোমরা সকলে আল্লাহর তাসবীহতে লিপ্ত হয়ে যাও।

* হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার অমুক বান্দার নিকট যাও এবং তার উপর এই কঠিন বিপদ চাপিয়ে দাও। তখন ফেরেশতারা তার নিকট আসে এবং তাকে মুসিবতে লিপ্ত করে। মুসিবত সত্ত্বেও সেই বান্দা যখন আল্লাহ পাকের তারীফ করে তখন সেই ফেরেশতা আল্লাহ পাকের নিকট ফিরে যায় এবং বলে আপনি যেভাবে বলেছিলেন, সেভাবেই তাকে বিপদগ্রস্ত করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ফিরে যাও এবং তার বিপদ দূর করে দাও। কেননা, আমি তাকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলাম যে, এই বিপদে সে আমাকে কিভাবে স্বরণ করে? অথচ আল্লাহ তা'আলা সবকিছু জানেন যে, সে তার প্রশংসাই করবে। কিন্তু তবুও এই অবস্থায় বান্দার মুখ থেকে গুরুরিয়ামূলক কথা বলানো এবং শ্রবণ উদ্দেশ্য। (তাবারানী)

* হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রাতের শেষ ভাগে কুরআন তেলাওয়াত করলে তা শোনার জন্য ফেরেশতারা হাজির হন। (তিরমিযী)

* হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সূরায়ে বাকারাহ তেলাওয়াত কালে তার প্রতিটি আয়াতের সাথে আশিজন করে ফেরেশতার আসমান থেকে অবতরণ করেন। (মুসনাদে আহমদ)

* হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ফেরেশতাদের একটি জামাআত শুধুমাত্র যিকিরের মজলিস তালাশ করতে থাকে। যখন তারা যিকিরের মজলিস পায় তখন সেটিকে নিজেদের পাখা দ্বারা বেঁটন করে ফেলে এবং একজনকে আল্লাহ পাকের নিকট পাঠিয়ে দেয়। উক্ত ফেরেশতা সকলের পক্ষ থেকে আরয করে হে আমাদের রব! আমরা আপনার বান্দাদের নিকট থেকে এসেছি যারা আপনার বড়ত্ব বর্ণনা করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদেরকে আমার রহমত দ্বারা ঢেকে নাও। ফেরেশতা বলে, হে আল্লাহ! তাদের সাথে তোমার এক গোনাহগার বান্দাও আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাকেও আমার রহমত দ্বারা ঢেকে দাও, কেননা এটা এমন এক মজলিস যেখানে অংশগ্রহণকারী কেউ বঞ্চিত হয় না।

* হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ঘর থেকে বের হওয়ার সময় بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ বলে বের হয় ফেরেশতা তাকে বলে, তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেছে এবং তোমাকে সমস্ত অকল্যাণ থেকে হেফাজত করা হয়েছে। অতঃপর শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়। (তিরমিযী)

* রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী পড়ে ঘুমায় আল্লাহ তাআলা তার হেদায়েতের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন যে রাতভর তার হেফাজত করে।

* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন ঘরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা হলে শয়তান তৎক্ষণাত সেখান থেকে বের হয়ে যায়। (তারগীব)

* হযরত আইউব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা দশবার চতুর্থ কালেমা পড়ে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকে আর যদি সন্ধ্যায় পড়ে তাহলে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকে। (ইবনে হিব্বান)

* রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যারা আল্লাহর যিকিরের জন্য কোন জায়গায় একত্রিত হয় এবং তাদের উদ্দেশ্য থাকে শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করা তাহলে একজন ফেরেশতা আসমান থেকে ডেকে বলে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের গোনাহগুলিকে নেকী দ্বারা বদলে দেয়া হয়েছে। (তাবারানী)

* রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের প্রতিটি রাতে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করতে থাকে, হে পুণ্যের অন্বেষণকারী সামনে অগ্নসর হও আর হে পাপাচারী থেমে যাও, চক্ষু খোল। অতঃপর উক্ত ফেরেশতা বলে-আছে কেউ ক্ষমা প্রার্থী থাকে ক্ষমা করা হবে, আছে কেউ যাক্বাকারী যাকে দেয়া হবে? (তারগীব)

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বান্দা যখন কুরআন শরীফ

খতম করে তখন ষাট হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমত ও
মাগফিরাতের দুআ করতে থাকে। (দাইলামী)

* হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা জুমার দিন অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়তে থাক। কেননা এটা হাজির হওয়ার দিন। ফেরেশতারা সেদিন হাজির হয়। সুতরাং যে কেউ আমার উপর দরুদ পাঠ করে তার দরুদ আমার নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। (ইবনে মাজাহ)

* হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে গোত্রের কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকে সেখানে ফেরেশতা অবতরণ করে না।

* হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কারো দস্তরখানা মেহমানের আসা যাওয়ার কারণে উন্মুক্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দুআ করতে থাকে। (জামে সগীর, ২৯২৮)

* হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যারা রসুন কিংবা পিয়াজ খেয়েছে তারা যেন আমাদের মসজিদে না আসে। কেননা এগুলির দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতাদের কষ্ট হয়। (বুখারী)

* হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তখন আল্লাহ তাআলা তার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠান যে তার উপর অনেক রহমত বর্ষণ করে এবং বলে তুমি দুর্বল কেননা তোমাকে দুর্বল থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ওই মেয়ের লালন-পালনকারীকে কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্য করা হয়। আর যখন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তখন তার নিকটও একজন ফেরেশতা পাঠানো হয় যে তার কপালে চুম্বন করে আর বলে আল্লাহ তোমাকে সালাম বলেছেন। (মুজামে আওসাত, তাবারানী)

* হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক মুসলিম কাজির সাথে দুজন ফেরেশতা থাকে যারা তাকে সঠিক পথ নির্দেশ দিয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্যায়ের এরাদা করে। যদি সে জেনেশুনে

অন্যায়ের পক্ষপাতিত্ব করে সীমা লংঘন করে তাহলে ফেরেশতারা বিচারককে তার নিজের উপর সোপর্দ করে চলে যায়। (ভাবারানী)

* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রী যখন স্বামীর অবাধ্য হয়ে তার বিছানা ত্যাগ করে পৃথক শয়ন করে তখন পুনরায় স্বামীর বিছানায় না আসা পর্যন্ত ফেরেশতা তার উপর লানত বর্ষণ করতে থাকে।

(বুখারী শরীফ)

* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তোমরা নিজেদের জুতা দুই পায়ে মাঝখানে কিংবা সামনে রাখ। ডান দিকে রেখ না কেননা তোমাদের ডানে একজন ফেরেশতা আছে আর বাম দিকেও রেখনা কেননা তখন সেটা তোমার জন্য মুসলমান ভায়ের ডান দিকে হবে। (এটা হল নামায পড়াকালীন সময়ের কথা)

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন মুসলমানের শরীরে রোগ ব্যাধি প্রেরণ করা হয় তখন আল্লাহ তাআলা কেরামান কাতেবীনকে হুকুম দেন, আমার বান্দার জন্য প্রতিদিন এবং প্রতি রাতে ঐসব আমলের সাওয়াব লিখতে থাক যেগুলি সে অসুস্থ হওয়ার পূর্বে করত।

(ইবনে আবী শায়বা)

* হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইয়া আরহামার রাহিমীন বলে, একজন ফেরেশতা তার নিযুক্ত করে দেয়া হয়, উক্ত ব্যক্তি যখন তিনবার এই বাক্যটা বলে তখন ফেরেশতা তাকে বলে হে মানুষ! আরহামার রাহিমীন অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি মনোনিবেশ করেছেন, তোমার যা চাওয়ার আছে চাও, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা নেতৃত্ব প্রত্যাশা করে এবং তাতে কামিয়াব হয়ে যায় তখন আল্লাহ তাআলা সাত আসমানের উপর তার আলোচনা করেন। অতঃপর একজন ফেরেশতা তার নিকট প্রেরণ করেন যে, তার নিকট যেয়ে এই কাজ থেকে বিরত রাখ। কেননা আমি যদি

তাকে এটা দিই তাহলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। সুতরাং ফেরেশতা তাকে এ থেকে বিরত রাখে।

* হযরত কাআব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন রোযাদার ব্যক্তির সামনে খানা খাওয়া হয় তখন খানা শেষ হওয়া পর্যন্ত উক্ত রোযাদারের জন্য ফেরেশতারা দুআ করতে থাকে। (তিরমিযী)

* হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন মুসলমান সকাল বেলা কোন রোগী দেখতে যায় তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দুআ করতে থাকে। অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতা তার জন্য দুআ করতে থাকে। (তিরমিযী)

* হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এক মুসলমানের দুআ অন্য মুসলমান ভায়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে কবুল হয় আর দুআকারীর মাথার নিকট একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়, যখনই সে তার ভায়ের জন্য দুআ করে তখন ফেরেশতা আমীন বলতে থাকে। (মুসলিম শরীফ)

* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান যখন অন্য কোন মুসলমানের দিকে অস্ত্র তাক করে তখন অস্ত্র না নামানো পর্যন্ত ফেরেশতা তার উপর লানত করতে থাকে। (মুসলিম)

* হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রতিদিন সকালে আসমান থেকে দুইজন ফেরেশতা অবতরণ করে। তাদের মধ্যে একজন ফেরেশতা দুআ করে হে আল্লাহ! যে খরচ করে তাকে বদল দান কর আর অন্যজন দুআ করে হে আল্লাহ! যে মাল জমা করে রাখে তার মাল ধ্বংস করে দাও। (মিশকাত)

* হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন মুসলমান গৃহে প্রবেশ করে আল্লাহর যিকির করে অতঃপর দুআ পড়ে খানা খায় তখন শয়তান তার সাথীদেরকে বলে চলো, এখানে আমাদের থাকারও কোন জায়গা নেই আর খানায়ও কোন অংশ নেই। পক্ষান্তরে মুসলমান যখন ঘরে প্রবেশ

করে আল্লাহর যিকির করেনা তখন শয়তান সাথিদেরকে বলে, তোমাদের জন্য এখানে রাত্রি যাপনের সুযোগ হয়ে গেছে। (মিশকাত)

* হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যাদের খাওয়ার পেটে কোন এতিম শরীক থাকে শয়তান সেই পেটের ধারে কাছেও থাকে না।

(তাবারানী)

* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন স্বীয় মুসলমান ভায়ের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইশারা না করেন কেননা হতে পারে শয়তান তার থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তার মুসলমান ভাইকে আঘাত করতে পারে। ফলে শান্তি স্বরূপ তার জন্য জাহান্নামের ফায়সালা হয়ে যায়। (বুখারী)

* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান যখন অসুস্থ হয় তখন আল্লাহ পাক তার নিকট দুজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন যারা ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে থাকে যতক্ষণ তার জন্য দুই কল্যাণের কোন একটির ফায়সালা হয়ে যায় অর্থাৎ সুস্থতা কিংবা মৃত্যু। (গুআবুল ইমান)

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রুকনে ইয়ামানীতে দুজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে সেখান থেকে অতিক্রম করার সময় যারা দুআ করে ফেরেশতা দুই তাদের দুআয় আমীন আমীন বলতে থাকে। আর হজরে আসওয়াদে এত পরিমাণ ফেরেশতা আছে যাদের সংখ্যা সীমাহীন। (তারীখে মক্কা)

* হযরত তামীম দাবী (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মদীনা শরীফের বৈশিষ্ট হল, আল্লাহ তাআলা মদীনার প্রতিটি ঘরে একেকজন করে ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন যারা নিজেদের তরবারী নাড়াচাড়া করতে থাকেন। এই জন্যই মদীনা শরীফে দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। (তাবারানী)

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দরিদ্র মুমিন ব্যক্তি শীতের কারণে যখন কষ্ট পায় তখন ফেরেশতারা আফসোস করতে থাকে। আর যখন শীত চলে যায় তখন ফেরেশতারা আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে।

(তাবারানী)

* হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার ফেরেশতা এমন আছে যারা রাতের বেলা পৃথিবীতে অবতরণ করে এবং জিহাদের জানোয়ার এবং বাহনের ক্লান্তি দূর করে। কিন্তু ঐ সব পশুর ক্লান্তি দূর করে না যাদের গলায় ঘণ্টি বাধা থাকে। (তাবারানী)

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার একজন ফেরেশতা আছেন যিনি দিনরাত এই আওয়ায দিতে থাকেন, হে চল্লিশ বছর রাসের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ! তোমরা আমলের ক্ষেত্র তৈরী করেছ যা কাটার সময় খনিজে এসেছে।

হে ষাট বছর বয়সের অধিকারী! হিসাবের জন্য তৈরী হয়ে যাও! চিন্তা কর তুমি আখেরাতের জন্য কি পাঠিয়েছ আর কি আমল করেছ?

হে সত্তর বয়সের অধিকারী! যদি মাখলুককে সৃষ্টিই না করা হত আর যখন সৃষ্টি করাই হল তখন সে যদি জানত যে তাকে কি জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে!! (দায়লামী)

* হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সফরে যে ব্যক্তি দুনিয়াবী কথাবার্তা থেকে নিজের দিলকে হটিয়ে আল্লাহ তাআলার দিকে মুতাওজ্জাহ হয় তখন একজন ফেরেশতা তার সাথে চলতে থাকে।

(তাবারানী)

* হযরত ইয়াযীদ ইবনে শাজারাহ (রাঃ) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয় এবং তার রক্তের প্রথম ফোটা মাটিতে পড়ে তখন ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট দুইজন হুর তার নিকট আগমন করে এবং তার চেহারা থেকে ধুলাবালি পরিষ্কার করে। (হাকেম ৩/৪৯৪)

* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষ যখন একজন কিংবা দুইজন থাকে তখন তাদেরকে ক্ষতি করার চেষ্টায় থাকে কিন্তু যখন তারা তিনজন হয়ে যায় তখন আর কোন ক্ষতি করতে পারে না। কেননা তিনজন দ্বারা জামাআত হয়ে যায়।

* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষের নিকট তার রিযিক পৌছানোর

জন্য ফেরেশতা নির্দিষ্ট আছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, তোমরা যে ব্যক্তিকে এমন অবস্থায় পাবে যে কিনা ইসলামকে নিজের লেবাস-পোশাক বানিয়ে রেখেছে তোমরা আসমান-যমীন থেকে তার জন্য রিযিকের ব্যবস্থা কর আর অন্যান্য লোকদেরকেও রিযিক পৌছাও। এই অন্যান্য রা নিজেদের নির্ধারিত অংশের চেয়ে বেশি রিযিক পাবে না।

(আবু আওয়ানা)

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা জামারাতের নিকট ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন, যাদের হজ্জ কবুল হয় ফেরেশতারা তাদের পাথরগুলি উঠিয়ে নেন।

(তারীখে মক্কা)

ঈমানের আলামত

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ

آيَاتُهُ ۖ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

অর্থঃ- ঈমানদার তো তারাই যাদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়ে যায় আর যখন আল্লাহর আয়াত তাদেরকে তেলাওয়াত করে শোনানো হয় তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় আর তারা শুধু স্বীয় রবের উপরেই ভরসা করে। (সূরায়ে আনফাল, আয়াত-২)

* হযরত আবু উসামা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবীজীর নিকট জানতে চাইল ঈমান কি জিনিস? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আলাহ তাআলার হুকুম পূরা করে যখন তুমি খুশি অনুভব করবে আর কোন হুকুম ছুটে গেলে যখন তোমার কষ্ট পেরেশানী অনুভব হবে তখন মনে করবে তুমি মুমিন।

* হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ অনুভব করেছে, যে আলাহ তাআলাকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নবী হিসাবে পেয়ে খুশি হয়েছে। (মুসলিম শরীফ)

* হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, আমি নবীজীর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম কোন্ ঈমান উত্তম? তিনি বললেন, ওই ঈমান যার

সাথে হিজরত আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হিজরত কি? নবীজী বললেন, হিজরত হল এটা যে, তুমি গোনাহ পরিত্যাগ করবে।

(মুসনাদে আহমাদ)

* হযরত আমর ইবনে শুআইব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত সে ভাল-মন্দ তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

(আহমাদ)

* হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম একদিন নবীজীর সামনে দুনিয়ার কথা আলোচনা করছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং লক্ষ্য কর। নিশ্চয় অনাড়ম্বরতা ঈমানের অংশ, নিশ্চয় সাদাসিদা জীবন যাপন ঈমানের অংশ।

(আবু দাউদ)

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার বাহেশাত আমার আনীত দ্বীনের অনুগত না হবে।

(ইবনে মাজাহ)

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমি আমার জীবনের বড় একটা অংশ এইভাবে অতিবাহিত করেছি যে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে কুরআন শেখার আগে ঈমান শিখত। যে কোন সূরা নবীজীর উপর নাযিল হত তার হালাল-হারাম আমরা এভাবে শিখতাম যেমন তোমরা কুরআন শেখ। কোথায় ওয়াকফ করতে হবে সেটাও শিখতাম আর এখন তো আমি এমন লোকদেরকে দেখছি যারা ঈমান শেখার আগে কুরআন শিখে। তারা সুরায়ে ফাতেহা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিখে নিচ্ছে অথচ তারা জানেও না যে, সুরায়ে ফাতেহা আমাদেরকে কোন কাজের নির্দেশ দেয় আর কোন কাজ থেকে বিরত রাখে। এই সুরায় কোন আয়াতটা এমন আছে যেখানে যেয়ে থেমে যেতে হয় বরং সুরায়ে ফাতেহা বাতিল খেজুরের মত ছড়িয়ে দেয়।

* হযরত জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা কিছু কিশোর-যুবক নবীজীর খেদমতে থাকতাম, সেখানে আমরা প্রথমে ঈমান শিখেছি ফলে আমাদের ঈমান অনেক মজবুত হয়ে গেছে।

(ইবনে মাজাহ)

* আব্বাহ তাআলা স্বয়ং স্বীয় বান্দাদের দাওয়াত দিয়েছেন যাতে তারা ঈমান আনয়ন করে, তাহলে তাদেরকে তিনি স্বীয় হেফাজত ও দায়িত্বে নিয়ে নিবেন।

(হাইসামী ৫/২৩২)

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের হাকীকত পর্যন্ত পৌছতে পারবে না যতক্ষণ না সে ঈমানের চূড়ায় আরোহন করে আর ঈমানের চূড়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত পৌছতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট দারিদ্রতা ধনাঢ্যতার চেয়ে এবং ছোট হওয়া বড় হওয়ার চেয়ে বেশি পছন্দনীয় না হবে, আর তার প্রশংসাকারী এবং নিন্দাকারী তার নিকট সমান সমান না হয়ে যায়।

* হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের হাকীকত পর্যন্ত পৌছতে পারবে না যতক্ষণ না সে আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দানকারীকে আহমক মনে না করে।

* হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, বান্দার আব্বাহর সাথে এবং আব্বাহর বান্দার সাথে সম্পর্ক ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের খেদমত অন্যকে দিয়ে না করায় বরং নিজের কাজ নিজেই করে। পক্ষান্তরে যখন সে নিজের খেদমত অন্যের দ্বারা করায় তখন তার উপর হিসাব ওয়াজিব হয়ে যায়।

* হযরত উমর (রাঃ) বলেন, বান্দা এবং তার রিয়িকের মধ্যে একটি পর্দা আছে। বান্দা যদি সবরের সাথে কাজ নেয় তাহলে তার রিয়িক নিজেই তার কাছে হাজির হয়। আর যদি সে যেন তেনভাবে রিয়িকের জন্য চেষ্টা করে তাহলে সে উক্ত পর্দা ফেড়ে ফেলে, কিন্তু তাকদীরে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি পায় না।

* হযরত উমর (রাঃ) বলেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের বাতেনের এসলাহ কর তাহলে তোমাদের যাহের এমনিই ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা নিজেদের আখেরাতের জন্য আমল কর তাহলে তোমাদের দুনিয়াবী সমস্যা আব্বাহ পাকের পক্ষ থেকে এমনিই সমাধান হয়ে যাবে।

* হযরত আলী (রাঃ) বলেন, কিছু লোক আছে যাদের শরীর তো থাকে এই পৃথিবীতে কিন্তু তাদের রুহের সম্পর্ক থাকে আব্বাহর সাথে।

এ ধরনের লোকেরাই দুনিয়াতে আল্লাহর খলীফা। আর এরাই আল্লাহ তাআলার স্বীনের দাস্ত। হায়! সেসব লোকদেরকে দেখতে আমি বড্ড আগ্রহী।
(কানযুল উম্মাল, ৫/২৩১)

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বনী আদমের উপর সেই জিনিসই চাপিয়ে দেয়া হয় যাকে সে ভয় পায়। বনী আদম যদি আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় না পায় তাহলে তার উপর অন্য কিছু চাপিয়ে দেয়া হবে না। বনী আদমকে ওই জিনিসের হাওয়ালা করে দেয়া হয় যার দ্বারা তাদের লাভ বা ক্ষতির একিন করে। বনী আদম যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে লাভ-ক্ষতির মাধ্যম মনে না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলাও তাকে অন্য কিছুর হাওয়ালা করবেন না।

(কানযুল উম্মাল, ৭/৬৫)

* হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি একটা এরাদা কর আমিও একটা এরাদা করি কিন্তু সেটাই হয় যেটা আমি এরাদা করি। তুমি যদি তোমার ইচ্ছাকে আমার হাওয়ালা না কর তাহলে তোমার চাওয়ার পিছনেই তোমাকে আমি ক্লান্ত করে ছাড়ব, আর দেব সেটাই যেটা আমি চাই।

* হযরত উবায়দা (রাঃ) বলেন, মুমিনের দিল পিপিলিকার মত, যেটা প্রতিদিন অসংখ্যবার এদিক ওদিক ওলট পালট হতে থাকে।